আল্লামা শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আযিয-এর ফতোয়া
গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের রায় এবং এ বিষয়ের কিছু সংশয় নিরসন

ইসলামের দৃষ্টিতে ‘গণতন্ত্র’ -এর আসল রূপ

অনুবাদক: আবু মাহদী মুহাম্মদ বারী

আল-হাদীদ প্রকাশনী
মগবাজার, ঢাকা

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

"যারা মনোযোগ সহকারে কথা (ভাল উপদেশ সমূহঃ লা- ইলাহা- ইল্লাল্লাহ্ - আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, ইসলামের একত্ববাদ, ইত্যাদি) শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম (আল্লাহ্র একক ইবাদত করা, তাঁর নিকট তওবা করা এবং তাগুতের সাথে কুফ্রী করা, ইত্যাদি) তা গ্রহণ করে, তাঁরাই হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত এবং মানুষের মধ্যে তাঁরাই হল বোধশক্তি সম্পন্ন।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:১৮)

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ফতোয়া একটি পবিত্র শব্দ, একটি পবিত্র ধারণা। একটি ধারালো অস্ত্র। জীবন সমস্যার সমাধানে এর ভূমিকা অতুলনীয়। ইসলামী পদ্ধতিতে এর প্রয়োজন অপরিমেয়। মুসলিম জীবন ধারায় এর অপরিসীম গুরুত্ব থাকার কারণেই এমন কি ভারতবর্ষে প্রচন্ড শক্তিধর বৃটিশ রাজত্বের বৈধতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে উসমানী খিলাফাহর নিকট থেকে ফতোয়া সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে থেকেও অবশ্য তারা ফতোয়া আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে যে কোন উত্তম জিনিসেরই যেমন ভেজাল ও নকল আবিষ্কার হয় বেশি তেমনি যুগে যুগে কুফ্র ও জাহিলিয়াতের পা-চাটা উলামায়ে 'ছু'[1] কর্তৃক ইসলামের এ স্বচ্ছ সলিলবৎ পবিত্র পদ্ধতির অপব্যবহারও কম হয়নি। আনন্দের বিষয় আল্লাহ্র ছায়ায় একদল উলামায়ে হাক্কানী সকল যুগেই বর্তমান ছিলেন।

সম্প্রতি আমাদের দেশে পবিত্র ফতোয়া শব্দটিকে কেন্দ্র করে ধর্মদ্রোহী মুরতাদ শ্রেণী ও তাদের অনুসারীরা একটি নতুন ফিতনা শুরু করেছে। ইসলাম ও মুসলিমকে বিকৃত রূপদানের হীন মানসে তারা তাদের ধারাবাহিক কুৎসিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পবিত্র এ শব্দটিকে বীভৎস আকারে নতুন প্রজন্মের কাছে ঘৃণ্য রূপদানের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খান্নাস[2] -এর দল কথায় কথায় 'ফতোয়াবাজ ফতোয়াবাজ' চিৎকার দিয়ে শব্দটির মারাত্মক অপব্যবহারের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ্র দ্বীনকে হেয় করার হীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু হায়, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! একদা বিজয়ী আদর্শের অনুসারীরা নিজের ঘরের শত্রু বিভীষণদের হাতে কুপোকাৎ হয়ে হীনমন্যতায় ভুগছে। অপর পক্ষে ওরা মারাত্মক অন্যায়ভাবে তাদের মুসলিম নামগুলো ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করছে। ওরা যখন হাক্কানী উলামাগণ কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক ফতোয়াগুলোর কথা বলে ধূম্রজাল সৃষ্টির পাঁয়তারা করে তখন এরা আত্মরক্ষামূলক পলায়নী মানসিকতায় ভোগে, মূল বক্তব্য থেকে দূরে সরে আসার চেষ্টা করে, ঐ ফতোয়াগুলোর 'গ্লানি' থেকে গা বাঁচাতে চায়। অথচ এদের উচিত ছিল বজ্রনিনাদে এর পক্ষাবলম্বন করা। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুগশ্রেষ্ঠ শায়খ মিশরের শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত এমনি একটি ঐতিহাসিক ফতোয়া। আজ প্রয়োজন ছিল এ ফতোয়ার আসল কপি জনসমক্ষে প্রকাশ করে সমস্ত ধূম্রজাল ছিন্ন করে এর ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরা। কেননা এ মহান চিন্তাবিদের সমস্ত আশংকাই আজ জ্বলন্ত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। ইংরেজদের প্রবর্তিত খোদাহীন বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল আজ প্রত্যেকের হাতে হাতে। এ কুৎসিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই মুসলিম জাতির আকৃতি ও প্রকৃতি আজ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। চিন্তা-চেতনার দিক থেকে উম্মাহর একটি অংশ আজ দ্বীন থেকে শুধু অনেক দূরেই নয় বরং ধর্মত্যাগের কাছাকাছি পৌছেছে। কেউ কেউ প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে তা-ই করছে। সে দূরদর্শী বুদ্ধিজীবি ওয়ালী আল্লাহ্কে আজ শত অভিনন্দন এ জন্য যে, অন্তত তাঁর বা তাঁদের সময়োপযোগী মহান ফতোয়ার ফলেই একদল লোক সকল বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে আজও শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তবে হ্যাঁ, ফতোয়া পথের দিশা দিতে পারে কিন্তু সে স্বয়ং কাজ করে দিতে পারে না। এ জন্য একদল জানবাজ লোকের প্রয়োজন হয়। তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে এ আদর্শকে আঁকড়ে ধরে প্রমাণ করবেন যে, তাঁরাই সত্যি। যখন ফতোয়া দেওয়া হবে- এ কাজটি এভাবে করো না তখন সাথে সাথে বাতলে দিতে হবে ওভাবে কর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রকৃত অনুসারী শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, নিজে মাঠে নেমে তা হাতে-কলমে শিক্ষাও দিবেন। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা বিরোধী ফতোয়াটি আংশিক হলেও সফল হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। পরবর্তী অনুসারীগণ আরেকটু মেহনত করে নিজস্ব পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত যোগ্যতা সৃষ্টির উপাদানগুলোর সংযোগ সাধন করতে পারলে তা অবশ্যই ষোলকলায় পরিপূর্ণ হতে পারত।

বর্তমান ফতোয়াটির ব্যাপারেও অনুরূপ বক্তব্য প্রযোজ্য। অবশ্য এ ফতোয়ার শুধু সমস্যাই নির্দেশ করা হয়নি বরং এর সমাধানে বিকল্প পদ্ধতিও নির্দেশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ফতোয়াদাতা স্বয়ং এর মাঠকর্মী। সুতরাং মুসলিমদের মধ্য থেকে একটি দলও যদি এ আদর্শকে গ্রহণ করে তাহলে ইনশাআল্লাহ্ নির্যাতিতের কান্নার জবাবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় অতি নিকটবর্তী।

উম্মাহ আজ একটি বিপ্লবের প্রসব বেদনায় কাতর। আমরা এর সমব্যথী। ইনশাআল্লাহ্ বিপ্লব অত্যাসন্ন। কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ***"আর বলুন, সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।"*** (১৭:৮১)।

---

[1] উলামায়ে 'ছু' - মন্দ আলেমরা- যারা তুচ্ছ মূল্যে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিক্রি করে দেয়।

[2] খান্নাস - কুমন্ত্রণাদায়ক।

তাই সবাইকে সচেতন থাকতে হবে যাতে সে বিপ্লব সঠিক ধারায় প্রবাহিত হয়। শত্রুরা যাতে আবার সে বিপ্লবের ফলাফল ছিনতাই করতে না পারে- যার নমুনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমাদের কাছে সে বিপ্লবই একমাত্র গ্রহণযোগ্য যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে "খিলাফাত আলা মিনহাজিন নুবুওওয়াহ"। এমন কি শুধু 'খিলাফাহ' নয়- নয় উমাইয়া, আব্বাসীয় কিংবা উসমানীয়দের নব সংস্করণ।

আমরা মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, কারো মনে আঘাত দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু আমাদের মাওলার পরম রেজামন্দি হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাহদেরকে সঠিক পথের দিশা দানের জন্যেই এ ফতোয়াটি বাংলায় তরজমা করে প্রকাশ ও প্রচার করছি। এছাড়া আমাদের অন্য কোন মতলব নেই। কারো প্রতি আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই করজোড় মিনতি, কেউ এটাকে ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে গ্রহণ করবেন না। বরং উন্মুক্ত মনে দ্বীনের স্বার্থ ও উম্মাহ্‌র কল্যাণকে সামনে রেখে বিচার-বিবেচনা করবেন। শায়খের ইল্‌ম, আমল, মুজাহাদা, বয়স, মেধা, ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রসরতাকে সামনে রেখেই আমরা এ ফতোয়াখানা প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আবিলতামুক্ত মনে পাঠ করলে অবশ্যই দেখতে পাবেন শায়খ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে খুব কম কথাই বলেছেন। বরং আল-কুরআন, হাদীস এবং সলফে সালেহীনের বক্তব্যের বহুল উদ্ধৃতি দ্বারাই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

এ পুস্তিকাখানা মূলত : শায়খের আরবীতে সুলিখিত বিশাল কিতাব "আল- জামে'আ ফী তালাবিল ইল্‌ম-ই-শরীফ" প্রথম খন্ডের ১৪৬-১৫৫ পৃষ্ঠার তরজমা মাত্র। আমরা এর ইংরেজী কপি থেকে ভাষান্তর করেছি। সমস্ত ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। একমাত্র তাঁরই আশ্রয় ও বন্ধুত্ব কামনা করি। তাঁর দরবারেই শুধু মস্তক অবনত করি। সমস্ত কুফর, ফিসক্ব, নেফাক্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। মুসলিম রাষ্ট্রে ব্যবস্থায় বিশ্ব মালিকের শরীয়াহ্‌ রদকারী কাফেরদের ধ্বংস কামনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দাহ্‌ ও রাসূল। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি সারা জাহানের প্রভু (রব)।

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জিহাদ শেষে বড় লরি ভর্তি কিতাব বোঝাই করে শায়খ চলেছেন আফগানিস্তান ছেড়ে। সীমান্তে কাস্টম অফিসাররা বাধা দিল। তারা তাঁকে একজন বই ব্যবসায়ী মনে করে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট লাইসেন্স দেখাতে বলল। শায়খ বললেন, সবগুলো কিতাবই তাঁর নিজের। কিন্তু নাছোড় কাস্টম অফিসাররা এতগুলো পুস্তককের মালিকানা প্রমাণ পেশ করতে বলল। শায়খ বললেন, ঠিক আছে তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার, প্রত্যেকটি কিতাবের কোন না কোন জায়গায় হাতে লেখা নোট পাবে। অনুসন্ধান করে শায়খের কথা সত্য বুঝতে পেরে তারা তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিল।

তিনি হচ্ছেন শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আযীয। শুধু একজন জ্ঞান পিপাসুই নন, জিহাদের আমীরও। আল্লাহ্‌র মহব্বতে দ্বীনকে গালিব করার স্বপ্ন নিয়ে নিজ বাড়ি-ঘরের মোহ ত্যাগ করে যিনি দেশে দেশে জিহাদের অগ্নিমশাল জ্বেলে ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি কোন অলস ফতোয়াবাজ নন। জন্ম কায়রোর নিকটবর্তী স্থানে একটি দ্বীনদার পরিবারে। তাঁর ইল্‌মে দ্বীন ও শরীয়াহ্‌র ওস্তাদ এবং রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরু হচ্ছেন ইহুদী কাফির ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র কবলিত হয়ে আমেরিকার পশুবাদী জিন্দাখানায় নির্যাতিত অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, মাত্র দশ বছর বয়সে আল-কুরআন কণ্ঠস্থকারী জন্মান্ধ হাফিজ বিশ্ব বিখ্যাত আল-আযহারের শায়খ মহান মুজাহিদ ওমর আহমদ আলী আব্দুর রহমান। পঞ্চাশোর্ধ শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আযীয প্রথম জীবনে একজন চিকিৎসক হিসেবে মিশরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু জিহাদের হাতছানী বেশীদিন তাঁকে সেখানে টিকতে দেয়নি। আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) এবং তাঁর পরিবার, শহীদ আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল, শায়খ আব্দুল কাদির আওদাহ শহীদ এবং অন্যান্য অগণিত মুজাহিদীনের ব্যক্তিত্ব ও কুরবানীতে আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র জীবনেই তিনি ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হন। ১৯৭৯ ঈসায়ী সনের প্রারম্ভিক দিক দিয়ে মিশরের জামাত আল-জিহাদ -এ যোগদান করেন। একই বছর কমিউনিস্ট কাফিরা আফগানিস্তান দখল করার পর তিনি আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আফগান জিহাদে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এখানে তিনি ইসলামের আরেক শ্রেষ্ঠ সন্তান আল-আযহারের শায়খ শহীদ আব্দুল্লাহ্‌ আয্‌যামের সংস্পর্শে আসেন, যিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন - 'সলফে সালেহীন এবং আহলুল ইলমগণের সর্বসম্মতিক্রমে একবিঘত পরিমাণ মুসলিম ভূমি শত্রু কবলিত হলে পর্যায়ক্রমে সমগ্র উম্মাহ্‌র ওপর জিহাদ করা ফরযে আইন', যা সর্বপ্রথম ইবনে লাদনা মসজিদে সৌদী আরবের গ্রান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায কর্তৃক ঘোষিত হয় এবং সাবেক সৌদী গ্রান্ড মুফতি ও ইয়েমেনের গ্রান্ড মুফতিসহ একদল পন্ডিত ও জিহাদের আমীর কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। লাল ফৌজের ওপর বিজয়ী হওয়া পর্যন্ত উভয় শায়খই আফগান জিহাদে শরীক ছিলেন। কিন্তু বিজয়ের পর মুজাহিদদের মধ্যে অন্তকলহ শুরু হলে তিনি আফ্রিকার একটি উদীয়মান ইসলামী দেশের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। আফগানিস্তানে তাঁর অবস্থানকালে শায়খের দায়িত্ব ছিল শরীয়াহ্‌র ওপর গবেষণা। এ সময় তিনি "আল-উমদা ফী লাদাদ আল-উদ্দাহ লিল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌" কিতাবখানা রচনা করেন যা বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের জন্য একটি মহান প্রেরণার উৎস। তাঁর পরবর্তী কিতাব খানা হচ্ছে "আল-হাদী ইলা সাবিলির রাশাদ"। কিতাবখানা প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার যা তিনি সাত বছরে সমাপ্ত করেন। এতে যে সব বিষয়ে মুসলিমগণ এখনো বিভ্রান্তির শিকার তা আলোচনা করা হয়েছে। উম্মাহ এখন ইসলামের সাথে বেমানান ধর্মদ্রোহী মতাদর্শগুলোর প্রচন্ড আক্রমন মুকাবেলা করছে। তিনি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, গণতন্ত্র হচ্ছে কুফ্‌র এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এটা হচ্ছে বর্তমান পাশ্চাত্যের ধর্ম এবং নিখাদ কুফর ও শির্‌ক। উম্মাহ্‌র একটি অংশ আজ পরাজিত মানসিকতার শিকার হয়ে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র রোষ থেকে বাঁচতে হলে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তিনি মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোরও মুখোশ উম্মোচন করেন এবং আল্লাহ্‌র শরীয়াহ্‌র শাসন ও বর্তমান শাসকদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী আমদানীকৃত বেমানান 'ইজম'গুলোর শাসনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেন।

সম্প্রতি শায়খ ইয়েমেনে বাস করছেন এবং জিহাদের দাওয়াত ও তারবিয়াত লিপ্ত রয়েছেন।[৩] আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের অন্তরে জিহাদের অগ্নিমশাল পুনঃপ্রজ্বলিত করার তাঁর এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্য অনুধাবন করার তৌফিক দিন। সম্মানিত শায়খকে সুস্থ, সুদীর্ঘ, সৎ কর্মময়পূর্ণ হায়াত ও উত্তম জাযা দিন। আমীন।।

[৩] বর্তমানে তিনি জালেম শাসকদের কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছেন, আল্লাহ্‌ তাঁর মুক্তি তরান্বিত করুন।

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। অতঃপর শান্তি বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পরিবার বর্গের ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) এর উপর শেষ দিন পর্যন্ত।

আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (রহ.) বলেন, "জেনে রাখো, কর্ম যদিও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে, যেমনঃ করা, বলা, চলা, স্থির থাকা, ধাক্কা দেয়া, চিন্তা করা, স্মরণ রাখা ইত্যাদি যা গুণে কিংবা অনুসন্ধান করে শেষ করা কল্পনাতীত তা মূলত তিনটি শ্রেণীতে আবদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে - পাপ, আনুগত্য বা সওয়াব এবং মুবাহ (অনুমোদিত কথা বা কাজ)।

প্রথম শ্রেণী : পাপ সমূহ। নিয়্যতের কারণে এগুলোর প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। অতএব অজ্ঞদের চিন্তা করা এবং বোঝা উচিত যে, "কর্মসমূহ হচ্ছে নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল"- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীতে ব্যাপকতার জন্য ভাল নিয়্যতের দ্বারা কোন পাপ কাজ সওয়াবের কাজে পরিবর্তিত হতে পারে না। যেমনঃ মঙ্গলের নিয়্যতে অন্যের অন্তরকে খুশি করার জন্য কারো গীবত করা, অন্যের টাকায় দরিদ্রকে খাদ্যদান অথবা অবৈধ অর্থের দ্বারা মাদ্রাসা, মসজিদ কিংবা সেনানিবাস তৈরী করা এসবই হচ্ছে অজ্ঞতা এবং এগুলোর জুলুম, অন্যায় ও পাপ হওয়ার ব্যাপারে নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে অসৎ উপায়ে সওয়াব লাভের চেষ্টা করার অর্থ - যা শরীয়াহ্‌র উদ্দেশ্যেও বিপরীত- হচ্ছে আরেকটি পাপ। তাই কেউ যদি এ ব্যাপারে সচেতনভাবে এরকম করে তা হলে শরীয়াহ্‌র বিবেচনায় সে অবাধ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু যদি অজ্ঞতার কারণে এটাকে এড়িয়ে যায় তাহলে গুনাহগার হবে। কারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর বাধ্যতামূলক। অধিকন্তু যেখানে শরীয়াহ্ অনুযায়ী ভাল কাজগুলোও গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে অসৎ কাজগুলো কিভাবে ভাল বলে গণ্য হতে পারে? তা কক্ষনো সম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে যে সব জিনিস এটাকে অন্তরে উদ্রেক করে সেগুলো হচ্ছে গোপন আনন্দ এবং আত্মিক বাসনা।

তিনি (আল-গাজ্জালী) বলতে থাকেন, যার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে যে কেহ মূর্খতার জন্যে পাপ পথে ভাল কাজ করার নিয়্যত করবে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, যদি না সে একজন নওমুসলিম হয় এবং ইতিমধ্যে জ্ঞানার্জনের সময়ও না পেয়ে থাকে। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ
"আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অতএব আহলুল জিক্‌র (জ্ঞানী, আল্লাহ্ ভীরু, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে এমন ব্যক্তিদেরকে) জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" (১৬:৪৩)।

এবং তারপর তিনি (আল-গাজ্জালী) আরও বলেন, অতএব "কর্মসমূহ নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল"- তাঁর (সা.) এ বাণী সংশ্লিষ্ট তিনটি শ্রেণীর মধ্যে যতদূর সওয়াবের কাজ ও মুবাহাত (অনুমোদিত) কাজদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ; পাপ কাজের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা খারাপ নিয়্যতের কারণে ভাল কাজও পাপে পরিণত হতে পারে; তেমনি নিয়্যতের পার্থক্যের কারণে মুবাহ বিষয়ও পাপ কিংবা সওয়াবে রূপান্তরিত হতে পারে; কিন্তু ভাল নিয়্যত রাখার কারণে পাপের কাজ কখনো সওয়াবের কাজে পরিবর্তিত হতে পারে না। হ্যাঁ, নিয়্যত পাপের কাজেও হস্তক্ষেপ করতে পারে; আর তা হচ্ছে যখন অন্যান্য অনেকগুলো খারাপ উদ্দেশ্য (নিয়্যত) একই পাপকার্যে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং যা এর বোঝাকে এবং বিশাল দুষ্ট পরিণামকে আরো স্ফীত করবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী : আনুগত্য বা সওয়াবের কাজ। এগুলো খাঁটি (বুনিয়াদের সাথে সম্পর্কিত) নিয়্যতের এবং পুরস্কার বৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত। যেমন, মূলত প্রত্যেকের উচিত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনার নিয়্যত করা এবং এর (আনুগত্যের) সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু কেউ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তা করে তাহলে তা একটি পাপে পরিণত হবে। ভাল নিয়্যতের পরিণাম বৃদ্ধির সাথে পুরস্কার বৃদ্ধিও জড়িত। কারণ কেউ একই সওয়াবের কাজে অনেকগুলো ভাল নিয়্যত রাখতে পারেন। অতঃপর মহাসত্যের (আল-কুরআন) খবর অনুযায়ী প্রত্যেকটি পুরস্কার দশগুণ (হতে আরও অধিক বৃদ্ধি) পাবে- এবং তিনি (আল-গাজ্জালী) বলেনঃ

তৃতীয় শ্রেণী : মুবাহাত (অনুমোদিত কাজ ও কথা)। প্রত্যেকটি মুবাহ কাজে এক বা একাধিক নিয়্যত রাখা যেতে পারে যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থার অন্যতম হতে পারে এবং যার দ্বারা সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্জিত হতে পারে। যে ব্যক্তি এগুলো উদ্দেশ্যহীন গবাদী পশুর ন্যায় নিয়্যতবিহীন এবং অসতর্কভাবে করে তার কি বিরাট ক্ষতিই না হয়।

একটি উপকারী বিষয়ঃ একমাত্র সুনির্দিষ্ট বৈধ প্রমাণ ব্যতীত নিয়্যত দ্বারা পাপ কাজ কখনো অনুমোদিত (মুবাহ) হিসেবে পরিগণিত হতে হয় না।

জেনে রাখুন, হযরত আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (রহ.) পূর্বোল্লেখিত বক্তব্য অনুযায়ী পাপ কাজ কখনো অনুমোদিত (মুবাহ) কিংবা সওয়াবে রূপান্তরিত হয় না। আরও জেনে রাখুন, যদি কখনো কোন সুনির্দিষ্ট উপলক্ষে কোন পাপ কাজের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে তা সে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত ব্যবহার করা সিদ্ধ নয় এবং তা শুধুমাত্র নিয়্যতের কারণেও দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ:

(ক) মিথ্যা বলা মহাপাপ (গুনাহ কবীরা) এবং এটা নিষিদ্ধ। তথাপি তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয (অনুমোদিত)। তবে তা শুধুমাত্র নিয়্যতের কারণে নয় বরং আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) হাদীসের কারণে। তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে: যুদ্ধ, ঝগড়াঝাটি নিরসন এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলমিশ।

(খ) মৃত পশুর গোশত হারাম এবং তা ভক্ষণ করা কবীরা গুনাহ। তথাপি অনন্যোপায় ক্ষুধার্তের জন্য তা হালাল। তাও আল্লাহ্‌র কিতাবের ভাষ্যের কারণে, নিয়্যতের জন্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং সে সব জীবজন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।"*** (২:১৭৩)।

তবে যে প্রমাণ দ্বারা (অস্থায়ীভাবে) কোন পাপ কাজ বৈধ হয় তা শুধু সে বিষয়ই সীমাবদ্ধ এবং অবশ্যই তা কিয়াসের শর্তাধীন নয়।

আসলে আমার পঠিত একখানা ফতোয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমি এ উপকারী বিষয়টি উল্লেখ করেছি। ফতোয়াটি দান করেছেন বর্তমান যুগের অন্যতম শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায। এ ফতোয়ায় তিনি আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেওয়ার নিয়্যতে অথবা এ জাতীয় কোন উদ্দেশ্যে মানব রচিত আইনে শাসিত দেশসমূহে আইন রচনাকারী পার্লামেন্টে মুসলিমদের জন্য সদস্য প্রার্থী হওয়াকে অনুমোদনযোগ্য করেছেন। "কর্মসমূহ নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল" এ হাদীস দ্বারা তিনি এটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

আইনসভার সদস্য প্রার্থী হওয়ার বৈধতা এবং আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী দ্বীনি ভাইদের আইন সভায় নির্বাচনের নিয়্যতে ভোটদানের উপায় গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামের রায় প্রসংগে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে অবশ্য "লিওয়া আল-ইসলাম" ম্যাগাজিনের ১৪০৯ হিজরী সনের ১১শ' সংখ্যায় (ক্রোড়পত্রের ৭ম পৃঃ) উল্লেখ করেন, আইনসভায় যোগদানে কোন পাপ নেই। হযরত শায়খ বিন বায ফতোয়ার শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, *'সব কাজই নিয়্যত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করে তাই পায়।'* তাই সত্যের সমর্থন এবং মিথ্যার বিরোধিতার শর্তে আইনসভায় যোগদানে কোন পাপ নেই। কারণ এর অপরিহার্য ফল হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীদের সংগী হয়ে সত্যের সাহায্য করা। তদ্রুপ আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী এবং সত্য ও সত্যানুসারীদের সমর্থক ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণকে নির্বাচনে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভোটদানে অংশগ্রহণ করাতেও কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ই একমাত্র তৌফিকদাতা।" বিন বাযের ফতোয়া এখানেই শেষ।

আমি বলছি, "নিয়্যত দ্বারা পাপ কাজ অনুমোদনযোগ্য হয় না"- আল-গাজ্জালীর এ উদ্ধৃতি অনুযায়ী এটা একটা ভুল ফতোয়া। অধিকন্তু কুফ্‌র হচ্ছে সর্ববৃহৎ পাপ। আর যেহেতু আইনসভায় যোগদান হচ্ছে কুফর তাই নিয়্যতের কারণে তা অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। এটা এ কারণে যে, আইনসভার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়। তাই এতে অংশগ্রহণ কিংবা সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানা নির্ভর করে বাস্তব জ্ঞানসাপেক্ষে গণতন্ত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানার ওপর। কারণ, ফতোয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি (নির্দিষ্ট) অবস্থার ওপর (ইসলামের) আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে জানা। এরূপে আমরা গণতন্ত্রের বাস্তবতার বিশদ ব্যাখ্যা দ্বারা শুরু করে এ ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং অতঃপর পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দিন।

গণতন্ত্রের আসল রূপ

ভূমিকা: শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, "ফুক্বাহায়ে কেরাম বলেন, 'নামসমূহ হচ্ছে তিন প্রকার। এক: যেগুলোর সংজ্ঞা শরীয়াহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। যেমন, সালাত এবং যাকাত। দুই: যেগুলোর সংজ্ঞা (আরবী) ভাষায় প্রদত্ত। যেমন, সূর্য এবং চন্দ্র। তিন: যেগুলোর সংজ্ঞা (জনসাধারণের) মধ্যে থেকে অবগত হওয়া যায়। যেমন, আল-ক্বাবদ (সংকুচিত করা) শব্দটি এবং "সম্মান" শব্দটি যার উল্লেখ আল্লাহ্ করেছেন, এবং তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে বসবাস কর সম্মানজনকভাবে'।" (মাজমু আল-ফাতাওয়া ১৩/২৮। তিনি এ গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে [৭/২৮৬, ১৯/৫২৩] তা পুনরুল্লেখ করেছেন)।

যেহেতু গণতন্ত্র (Democracy) শব্দটির উল্লেখ শরীয়াহ্‌তে নেই এবং এটি আরবী ভাষার শব্দও নয়, তাই এর অর্থ ও প্রকৃত বাস্তবতা জানার জন্য সে সব মানুষের প্রথা বা রীতিনীতির মুখাপেক্ষী হতে হবে যারা এর বিধি-বিধান রচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনুল কায়্যিম মুফতি হওয়ার নিয়ম-কানুনের ওপর রচিত 'আহকামুল মুফতি' তে বলেন, "(তাঁর (মুফতি) জন্য অনুসমর্থন (চুক্তি, ইত্যাদি), শপথ ঘোষণা অথবা শব্দের (অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার নাম সমূহ) সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাপারে মূল ভাষাভাষীদের প্রথা না জেনে এসব শব্দ থেকে সচরাচর নিজের বোঝা অর্থের ওপর নির্ভর করে ফতোয়া দান করার অনুমতি নেই। অতএব তাঁর উচিত তারা (ঐ ভাষাভাষী মানুষ) যেভাবে অভ্যস্ত এবং জ্ঞাত সেভাবে ফতোয়ায় প্রয়োগ করা, এমন কি যদি তা (এ শব্দসমূহের) বুৎপত্তিগত অর্থের বিপরীতও হয়। কিন্তু যখনই তিনি অন্যথা করবেন তখনই নিজেকে এবং অন্যান্যদেরকে বিপথে পরিচালিত করবেন।" (ইলামউল-মুত্তয়াক্বকীন ৪/২২৮)

এসবই হচ্ছে গণতন্ত্রের অর্থ অবগত হওয়ার জন্য যারা এর আসল জনক তাদের কাছে বিষয়টি অর্পণ করার বাধ্যবাধকতা। এরূপে কেউই নিজের মতলবমত এটাকে শূরা (ইসলামী পরামর্শ), রাজনীতি চর্চার (উপায়) অথবা অন্য কোন নামে বলতে পারবে না যার দ্বারা গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ এবং অতঃপর (এরূপ সংক্রান্ত ইসলামের) সিদ্ধান্ত হারিয়ে যায়।

যেহেতু গণতন্ত্র একটি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক পরিভাষা তাই এর প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়ার জন্য- যার ওপর গণতন্ত্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভরশীল- পূর্বোল্লিখিত ভূমিকা অনুযায়ী সে সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রথা অনুযায়ী গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জাতির তথা জনগণের প্রভুত্ব। আর এ প্রভুত্ব হচ্ছে একটি নিরংকুশ এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা অন্য কোন কর্তৃত্ব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়। এ কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছে জনসাধারণ কর্তৃক তাদের নেতা নির্বাচন এবং যে ধরনের আইনই তারা চায় তা প্রণয়ন করার অধিকার। সাধারণত জনসাধারণ এ কর্তৃত্বের অনুশীলন করে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে, যারা পার্লামেন্টে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কর্তৃত্বের ব্যবহার করেন। এনসাইক্লোপেডিয়া অব পলিটিক্স -এ উল্লেখ আছে, "সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা হচ্ছে 'প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী জনসাধারণ'। সারকথা, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের প্রভুত্বের নীতি"।[৪]

প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল-কিলালী আরো বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে প্রভুত্বের মালিক জনগণ নিজে আইন রচনার কর্তৃত্ব অনুশীলন করে না। বরং তারা এ অধিকার এম.পি. দেরকে দান করে, যাদেরকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্বাচিত করে এবং তাদের (জনগণের) নামে কর্তৃত্ব অনুশীলন করার মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করে। পরিণামে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদই (পার্লামেন্ট) হচ্ছে গণপ্রভুত্বের জিম্মাদার। সংসদই আইন প্রণয়ন এবং প্রণীত আইনের বিধি-বিধানের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এ ব্যবস্থা প্রথমে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে তাদের নিকট থেকে অন্যান্য দেশে হস্তান্তরিত হয় (পূর্বোক্ত, ২/৭৫)।

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী এটা পরিষ্কার যে, সংক্ষেপে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের প্রভুত্ব, যা মূলত অন্য কোন কর্তৃত্বের অধীনতাহীন আইন প্রণয়নের নিরংকুশ অধিকারের সংক্ষিপ্তসার। এখানে প্রভুত্বের কতগুলো সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল।

আইনের অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হামিদ মিতওয়ালী বলেন, "শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র জাতির প্রভুত্বে'র নীতিতে পরিণত হয়েছে।" অধিকন্তু সংজ্ঞানুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার ওপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই।[৫]

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ যোসেফ ফ্রাংকেল বলেন, "প্রভুত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর ওপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্ত সমূহ পুনর্বিবেচনা করার মত কোন বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী নেই।" এ মৌলিক অর্থ

---

[৪] আব্দুল ওয়াহাব আল-কিলালী সংকলিত এনসাইক্লোপেডিয়া অব পলিটিক্স, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৫৬।

[৫] (ড. মিতওয়ালীর "Ruling System in Developing Countries" সংস্করণ ১৯৮৫, পৃঃ ৬২৫)

সাম্প্রতিককালের পরিবর্তিত রূপ নয়। প্রভুত্বের ওপর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত জীন বোঁদার সংজ্ঞাটি অর্থাৎ "প্রভুত্ব হচ্ছে নাগরিকদের এবং ক্ষমতাশালীদের ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়" সঠিকই থেকে যায়। অবশ্য যদিও বোঁদা তার যুগে যে প্রভুত্বের অধিকারকে রাজার সাথে বিশেষায়িত করেছিলেন তা পরে জাতির কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।"
যোসেফ ফ্রাংকেল -এর The International Relationship তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃঃ ২৫

আধুনিক গণতন্ত্রের উৎপত্তি

গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে। তবে তারও এক শতাব্দী পূর্বে ইংল্যান্ডে সংসদীয় (পার্লামেন্টারী) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আদর্শগত ভাবে জাতির প্রভুত্বের নীতি- যা হচ্ছে গণতান্ত্রিক মাযহাবের (বা ধর্মের) ভিত্তিস্বরূপ- ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। জাতির প্রভুত্ব তত্ত্বের ভিত্তিরূপে পরিগণিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জন লক, মন্টিস্কু এবং জীন জ্যাক রুশোর লেখায় তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এটা ছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে ইউরোপে বিস্তৃত ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধ। এ মতবাদ অনুযায়ী রাজা ঈশ্বরের/আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে নিজের ইচ্ছেমত শাসন করতেন। পরিণামে যাজকদের সমর্থনে রাজাগণ চরম ক্ষমতার অধিকারী হন।

বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপীয় সম্প্রদায়গুলো নিরংকুশ শাসনে দারুনভাবে জর্জরিত হয়। সে তুলনায় তাদের জন্য জাতির প্রভুত্ব অর্জন করা সর্বোত্তম বিবেচিত হয় যাতে তারা রাজা এবং যাজকদের দাবীকৃত ঐশ্বরিক শাসনের চরম রাজত্ব থেকে রেহাই পেতে পারে। অতএব মূলত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খোদায়ী কর্তৃত্বের রিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের মালিক বানিয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিজের জীবন বিধান রচনার পথ পরিষ্কার করার জন্য।

ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্বের মতবাদ থেকে জাতির প্রভুত্বের মতবাদে উত্তরণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘটিত হয়নি। বরং এটা ছিল বিশ্বের রক্তাক্ততম ঘটনাগুলোর একটি। ফরাসী বিপ্লবের তো নীতিই ছিল ***"সর্বশেষ যাজকের নাড়িভুঁড়ি দ্বারা ঝুলিয়ে সর্বশেষ রাজাকে ফাঁসি দাও।"*** ডক্টর সাফার আল-হাওয়ালী বলেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো ফলাফল নিয়ে ফরাসী বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ইউরোপের ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি ধর্মহীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এর দার্শনিক ভিত্তি ছিল ঈশ্বর/আল্লাহ্‌র নামে কৃত শাসনের পরিবর্তে জনগণের নামে কৃত শাসন, ক্যাথলিকবাদের পরিবর্তে বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ধর্মীয় আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং গীর্জার সিদ্ধান্তের পরিবর্তে মানুষের তৈরী আইন।" (ড. সফর আল-হাওয়ালীর 'সেকিউলারইজম', পৃষ্ঠা ১৬৯, জমিয়ত-উল-কুরা সংস্করণ, ১৪০২ হিজরী)

বাস্তবিকপক্ষে ফরাসী বিপ্লবের নীতিমালা এবং শাসন পদ্ধতিতে জাতির প্রভুত্ব এবং বিধি-বিধান রচনায় তার অধিকারের মতবাদ পরিস্ফুটিত হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের অধিকার ঘোষণার ষষ্ঠ বিধানে তদ্রুপই বর্ণিত হয়েছে : ***"আইন হচ্ছে জাতির ইচ্ছার অভিব্যক্তি"***। তার অর্থ হচ্ছে আইন চার্চ (গীর্জা) অথবা খোদায়ী ইচ্ছার অভিব্যক্তি নয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী শাসন পদ্ধতির সাথে একসঙ্গে প্রকাশিত মানুষের অধিকারের একটি ঘোষণার পঁচিশতম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, *"প্রভুত্ব জনসাধারণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত"*। (ড. সাইয়েদ সাবরীর Principles of Ruling System. পৃঃ ৫২)

তাই আব্দুল হামিদ মিতওয়ালী বলেন, "১৭৮৯ সনের বিপ্লবের নীতিমালা ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।" - Ruling System in Developing Countries, পৃষ্ঠা ৩০।

গণতন্ত্র, সংসদ সদস্য (এম.পি.) এবং ভোটারদের ব্যাপারে ইসলামের রায়ঃ

গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের রায় নির্ভর করে এর অন্তর্ভুক্ত জনগণের প্রভুত্ব নীতির ওপর যার অর্থ: একটি সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা তার উর্ধ্বে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, কারণ এর কর্তৃত্ব স্বয়ম্ভূ। অতএব এটা নিজে যা ইচ্ছে করে তাই করে এবং অন্য কারো নিকট দায়ী না হয়ে নিজ ইচ্ছেমত আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু তা হচ্ছে খোদায়ী আরোপ করা। কারণ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"....। আর আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।" (১৩:৪১)।

তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,
"....। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদেশ করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।" (৫:১)।

অনুরূপ তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন,
"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা-ই করেন।" (২২:১৪)।

এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গণতন্ত্র মানুষকে আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা দান করে মানুষের ওপর উলুহিয়্যাত (ইবাদত পাবার দাবীদার) আরোপ করেছে। ফলে এটা আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষকে ইলাহ্ বানিয়েছে এবং সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার বিষয়ে তাঁর সাথে শির্‌ক করেছে। নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে কুফ্‌রে আকবর (অর্থাৎ সে কুফ্‌র যা কাউকে

ইসলামের সীমারেখার বাইরে নিয়ে যায়)। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে গণতন্ত্রের নতুন খোদা হচ্ছে মানুষের কামনা-বাসনা যা অন্য কোন কিছু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না হয়ে নিজের খেয়ালখুশি এবং আকাঙ্খা অনুযায়ী আইন/বিধান প্রণয়ন করে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,
"আপনি [হে মুহাম্মদ (সা.)] কি তাকে দেখেছেন, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য করে রেখেছে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন? অথবা আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শোনে অথবা বোঝে? তারা তো নিছক চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তারা আরও অধিক অধম!" (২৫:৪৩-৪৪)

এতে গণতন্ত্র একটি স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের রূপ লাভ করেছে, যে ধর্মে প্রভুত্বের মালিক জনগণ। অর্থাৎ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই নিজেদের কামনা-বাসনা/প্রবৃত্তি অনুযায়ী আইন/বিধান রচনা করে। অপরপক্ষে ইসলাম ধর্মে প্রভুত্বের মালিক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। যেমন আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বলেন, "প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা।" (সুনানে আবু দাউদ, আল-আদাব অধ্যায়, হাদীস সহীহ)

গণতন্ত্র যে মানুষের ওপর উলুহিয়্যাত (খোদায়ী) আরোপ করার বিষয় নিজের আওতাভুক্ত করেছে সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ওস্তাদ আবুল আলা মওদুদী বলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতিমালাঃ নিশ্চয়ই সে আধুনিক সভ্যতার ছত্রছায়ায় বর্তমান জীবন ব্যবস্থা, তার বিশ্বাস, আচরণ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসহ গড়ে উঠেছে তা তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হচ্ছেঃ সেকিউলারইজম (ধর্মহীনতা), জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র।" অতঃপর তিনি আরো বলেন, তৃতীয় নীতিটি (অর্থাৎ) গণতন্ত্র তথা মানুষের ওপর খোদায়ী আরোপ (এর নীতি) পূর্ববর্তী দু'টো নীতির সাথে একীভূত হয়ে বিশ্বের দুর্দশা ও শান্তিকে নিজের কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকারী চিত্রটিকে পরিপূর্ণতা দেয়। আমি (আল-মওদুদী) অবশ্য পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আধুনিক সভ্যতায় গণতন্ত্রের মানে হচ্ছে সংখ্যাগুরুর শাসন। অর্থাৎ কোন এলাকার অধিবাসীগণ তাদের সমাজকল্যাণ পূর্ণতাকারী বিষয়ের ব্যাপারে স্বাধীন এবং সে এলাকার আইন তাদের ইচ্ছে থেকে উদ্ভূত। তিনি বলেন, আর যদি এখন আমরা তিনটি নীতির ব্যাপারে বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে, সেকিউলারইজম প্রকৃতপক্ষে মানুষকে আল্লাহ্র উপাসনা, আনুগত্য, ভয় এবং প্রতিষ্ঠিত আচরণের নিয়ন্ত্রণবিধি থেকে মুক্ত করেছে। আর এর পরিণতিতে তারা যেখানে ইচ্ছে বিপদগামীর ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং অন্য কারো সম্মুখে দায়ী হওয়া ব্যতীত নিজেকে নিজের দাস বানিয়েছে। তারপর জাতীয়তাবাদ এসেছে তাদেরকে আমিত্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য এবং অন্যদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণের মত মাদকের বড় বড় গ্রাস গিলাতে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গণতন্ত্র এসেছে (অন্য সবকিছু থেকে) স্বাধীনতা দান করে তাকে নিজের ইচ্ছের কাছে বন্দী করে আমিত্বের আনন্দাবিষ্টে খোদায়ীর সিংহাসনে বসাতে। এভাবে তা আইন প্রণয়ন ও তৈরীর পূর্ণ ক্ষমতা তার ওপর ন্যস্ত করেছে এবং তার প্রার্থিত সবকিছু পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তার সেবায় এর সমস্ত সামর্থ্যসহকারে একটি শাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছে। অতঃপর আল-মওদুদী বলেন, "তাই আমি মুসলিমদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলছি যে, জাতীয়তাবাদী সেকিউলার গণতন্ত্র আপনাদের গৃহীত ধর্ম ও আক্বীদাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব যদি আপনারা এর কাছে আত্মসমর্পন করেন, তা হবে আল্লাহ্র কিতাবকে আপনাদের ত্যাগ করার শামিল; এবং যদি আপনারা এর প্রতিষ্ঠা কিংবা রক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনারা আল্লাহ্র রাসূলের (সা.) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তিনি বলেন, কোথাও এ ব্যবস্থা বর্তমান থাকার অর্থ হচ্ছে আমরা ইসলামকে শ্রদ্ধা করি না এবং যেখানেই ইসলাম বর্তমান রয়েছে সেখানে এ ব্যবস্থার কোন স্থান নেই।"[৬]

এ বক্তব্যের পর পাঠকের জন্য যা জানার বাকি থাকে তা হচ্ছে মওদুদী সাহেবের দল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী গণতন্ত্রকে পদ্ধতিগতভাবে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়, মৃত্যুর পর এবং আজ পর্যন্ত সেক্যুলার রাষ্ট্র পাকিস্তানের পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহ্র কাছে খুবই অসন্তোষজনক।"*** (৬১:২-৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, ***"তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদের ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবে কি তোমাদের জ্ঞান নেই?"*** (২:৪৪)।

যেহেতু গণতন্ত্রে জনগণই প্রভুত্বের মালিক এবং তারাই পার্লামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে এর অনুশীলন করে, অতএব পার্লামেন্ট (সংসদ) সদস্য এবং যারা তাদেরকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য ভোট দেয় উভয়ই কুফ্রীতে নিমজ্জিত। এম.পি.-দের

[৬] আল-মওদুদীকৃত, খলীল আল-হামিদী অনুদিত Islam & Modern Civilization.

কুফ্রীর কারণ হল তারাই কার্যত প্রভুত্বের মালিক এবং তারাই আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করে, হোক তা আইন প্রস্তুত করা, প্রণয়ন করা অথবা এতে সম্মতি দান করা। অধিকন্তু সকল আধুনিক সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী ***"আইন প্রণয়ন কর্তৃত্বের মালিক পার্লামেন্ট"***, এর নাম হাউস অব কমনস্, ন্যাশনাল এসেম্বলী, কংগ্রেস, লিজেসলেটিভ এসেম্বলী অথবা অন্য যা কিছুই হোক না কেন। এতে এম.পি. -দেরকে আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাতের (অর্থাৎ মানব জাতির জন্য আইন রচনার একচ্ছত্র অধিকারের যা তাঁর একটি কাজ) অংশীদার করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"তাদের কি এমন কতক শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক ধর্মের (জীবন ব্যবস্থা) বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?"*** (৪২:২১)।

ধর্মের এক অর্থ হচ্ছে 'মানুষের জীবন ব্যবস্থা' হোক তা সত্য কিংবা মিথ্যা।

কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে।"*** (১০৯:৬)।

সুতরাং কাফিররা যে কুফ্র -এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ধর্ম বলেছেন। অতএব মানুষের জন্য কেহ আইন প্রণয়ন করলে সে মূলত তাদের জন্য নিজেকে খোদায়ীর দায়িত্বে নিয়োজিত করল এবং আল্লাহ্র সাথে নিজেকে শরীক করল। এ হলো একটি প্রমাণ। এম.পি.-দের কুফ্রীর ব্যাপারে আরেকটি প্রমাণ হলো মানুষের জন্য আইন রচনা করে আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের নিজেদেরকে খোদায়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এটা হচ্ছে আল-কুরআনে উল্লেখিত কুফ্র -এর ঠিক অনুরূপ। যেমনঃ
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হল আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে রব (প্রভু) গ্রহণ না করে আল্লাহ্কে ত্যাগ করে।"*** (৩:৬৪)

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্ ব্যতীত আইন রচনা সংক্রান্ত রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব) একই জিনিস যা এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছেঃ
"তারা (ইহুদী ও খৃষ্টান) তাদের পন্ডিতদের এবং তাদের সংসার বিরাগী যাজকদের রব (প্রভু) বানিয়ে রেখেছে আল্লাহ্কে ছেড়ে এবং মরিয়মের পুত্র মসীহকেও।" (৯:৩১)

আদী বিন হাতিম (রা.) যিনি খৃষ্ট ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন, বলেন- আমি রাসূল (সা.) -এর কাছে এলাম যখন তিনি সূরা বারাআত (আত-তাওবাহ) তিলাওয়াত করছিলেন। "তারা (ইহুদী ও খৃষ্টান) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসার বিরাগী যাজকদের তাদের রব (প্রভু) হিসেবে গ্রহণ করেছে" -এ আয়াতে তিনি (সা.) পৌঁছলে আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.), আমরা কখনো তাদেরকে রব (প্রভু/পালনকর্তা) হিসেবে গ্রহণ করিনি।" তিনি (সা.) উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা তা করেছ। আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য হারাম করেছিলেন তা কি তারা তোমাদের জন্য হালাল করেনি এবং তোমরাও তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করনি এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য হালাল করেছিলেন তা কি তারা হারাম করেনি এবং তোমরাও তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করনি?" আমি বললাম, হ্যাঁ, তাই।' তখন তিনি (সা.) বললেন, 'তাই হচ্ছে তাদেরকে ইবাদত/উপাসনা করা।' (আহমদ ও তিরমিযী বর্ণিত সহীহ হাদীস)। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল-আলুসী বলেন, "অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে, 'প্রভু'র অর্থ এ নয় যে, তারা এদেরকে মহাবিশ্বের কর্তা মনে করত, বরং এর অর্থ হচ্ছে তাদের আদেশ-নিষেধ এরা মান্য করত।"

এসব থেকে বিষদভাবে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইহুদী পন্ডিত (আলেম), খৃষ্টান পাদ্রী বা সন্ন্যাসী এবং এম.পি.-দের (সংসদ সদস্য) মত যে-ই মানুষের জন্য আইন রচনা করে সে প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রভুত্বের আসনে সমাসীন করে এবং এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফ্র -এর জন্য যথেষ্ট। অতএব এ এম.পি.-দের যে কেউ এ সংসদীয় (পার্লামেন্টারী) শির্কের পদে রাজি থাকে বা এতে অংশগ্রহণ করে তার কুফ্র সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার। যে এম.পি. দাবী করে যে সে আসলে এতে সন্তুষ্ট নয় কিন্তু শুধুমাত্র দাওয়াত এবং পূণর্গঠনের জন্য পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছে সেও অনুরূপভাবে কাফির'। তার এরূপ বক্তব্য সাধারণ ও অজ্ঞ লোকদেরকে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে একটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটা হচ্ছে তার আত্মরক্ষার জন্য একটি ঢালস্বরূপ। তার কুফ্র -এর পশ্চাতে দলীল হচ্ছে, তার পার্লামেন্টে প্রবেশ ওদের কার্যকলাপের অর্থাৎ ফায়সালার জন্য মানুষের ইচ্ছের কাছে প্রার্থী হওয়ার বৈধতার সনদ এবং পার্লামেন্টের ও পার্লামেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতিমালার প্রতি আনুগত্য। তাই এ সবই হচ্ছে ফায়সালার জন্য স্বেচ্ছায় তাগুতের (মিথ্যা খোদা) কাছে ঝোকা যা কোন ব্যক্তিকে কাফিরে পরিণত করে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছে সোর্পদ কর।" (৪২:১০)

অপরপক্ষে গণতন্ত্র বলে, "আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর তার ফয়সালা পার্লামেন্টে গণপ্রতিনিধিদের হাতে অথবা গণভোটে অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে সোর্পদ কর।" আইনসভার সকল সদস্যই এ কুফ্‌রী নীতির অনুগত এবং যদি তারা এর সাথে সামান্যতম বিরোধিতা করে তাহলে তাদেরকে এর বিধান অনুযায়ী বরখাস্ত করা হবে। অতএব যে-ই আমাদের কাছে কুফ্‌র -এর ঘোষণা দিবে আমরাও তার তাকফীর (অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করা যা তাকফীর উল-মু'আইয়ান-আল-জামেয়া, ৪৮২ পৃষ্ঠায় সংজ্ঞায়িত) স্পষ্টভাবে তুলে ধরব। এ ধরনের লোক আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর জন্যও কাফির হয়ে যায় যেখানে বলা হয়েছে,

"আর কোরআনে তোমাদের প্রতি তিনি নির্দেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনতে পাবে আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি কুফরী ও উপহাস করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মোনাফেক ও কাফের সবাইকে জাহান্নামে একত্র করবেন।" (৪:১৪০)

সংসদ বা পার্লামেন্টগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণীসমূহে অবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা তাদের প্রধান কাজই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধানের পরিবর্তে আইন প্রণয়ন করা। অতএব যে তাদের পাশে বসে সেও তাদের মতই কুফ্‌র -এ নিমজ্জিত। সুতরাং যে তাদের আইন মান্য করে তাদের ব্যাপারে কি (সিদ্ধান্ত) হবে? বাস্তবিক আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলেছেন, "অতএব যে শুবুহাতকে (সন্দেহজনক জিনিস) এড়িয়ে চলে, প্রকৃতপক্ষে নিজের ধর্ম এবং সম্মানকে নিরাপদ রাখে।" তাহলে এসব এম.পি.-দের মত যারা কুফ্‌রকে এড়িয়ে চলে না তাদের ব্যাপারটি কি রকম হবে? তাদের ধর্ম কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারে? এবং যেখানে তারা কুফ্‌র -এর সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে সেখানে তাদের সম্মানের ওপর আক্রমন থেকে মানুষকে তারা কেন বিরত রাখতে চায়?

এম.পি.-দের আরেকটি কুফ্‌র কাজ সম্পর্কে কিছু লোক সচেতন নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আইন রচনাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণই তাদের একমাত্র কাজ নয়। বরং সমস্ত আধুনিক, সেক্যুলার (ধর্মহীন) শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী পার্লামেন্টই দেশের রাজনীতির সাধারণ দিক নির্দেশনা দান করে এবং আইন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের সকল কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করে। অর্থাৎ মানবরচিত আইনের দ্বারা শাসনের মত সমস্ত সরকার অনুশীলিত কুফ্‌র এবং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, শিক্ষা, সংবাদ মাধ্যম, অর্থনীতি ইত্যাদিতে ধর্মহীন সেক্যুলার পদ্ধতির অনুসরণের ব্যাপারে এম.পি.-রাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যারা সরকারকে তা বাস্তবায়নের লাইসেন্স প্রদান করে। সত্যিকার অর্থে এ কুফ্‌র নীতি থেকে সরকার বিচ্যুত হয়েছিল কিনা তার কৈফিয়ত তলব করারও তাদের (এম.পি.-দের) অধিকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কুফ্‌রকে স্বীকার করে অথবা এর বাস্তবায়নের অনুমতি দেয় তার কুফ্‌র -এর ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব কর্তৃক সংগৃহীত, ইসলামকে বিনষ্টকারী দশটি বিষয়সমূহের চতুর্থটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শায়খ বিন বায নিজেই বলেন, "অনুরূপভাবে যে ব্যক্তিই বিশ্বাস করবে যে, আচার, হুদুদ (ইসলামী দন্ডবিধি) বা এরূপ অন্য কোন বিষয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত শরীয়াহ্ ছাড়া (অন্য কোন আইনে) শাসন করা অনুমোদনযোগ্য, সে-ই এতে (অর্থাৎ ইসলামকে বিনষ্টকারী চতুর্থ বিষয়) অন্তর্ভূক্ত হবে। এমন কি প্রকৃতপক্ষে যদি এটাকে শরীয়াহ্‌র চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস নাও করে (তথাপি অন্তর্ভুক্ত হবে)। কারণ, এর অনুমতি দান করে সে ইজমা'র (সর্বসম্মতি) ভিত্তিতে (ঘোষিত) আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ করেছে। আর যিনা/ব্যভিচার, মদ, সুদ এবং আল্লাহ্‌র শরীয়াহ্ ব্যতীত অন্য আইনে শাসন করার মত ধর্ম থেকে অপরিহার্যভাবে জানা নিষিদ্ধ জিনিসকে যে-ই সিদ্ধ (হালাল) করবে, মুসলিমদের ইজমা' অনুযায়ী সে-ই কাফির।"[৭]

অধিকন্তু 'আরব জাতীয়তাবাদের সমালোচনা' নামক তাঁর রচনায় শায়খ বিন বায মানবরচিত আইনের শাসনকে এরূপে বর্ণনা করেছেন: "এটা হচ্ছে বিরাট দুস্কৃতি, সুস্পষ্ট কুফ্‌র এবং ধর্মত্যাগের ঘোষণা (রিদ্দা)।" (পৃষ্ঠাঃ ৫০)

এভাবে মানবরচিত আইনে সরকারের শাসনকার্যের জন্য এম.পি.-রা দায়ী। অনুরূপভাবে এ আইনসমূহের নতুন নতুন বিধি রচনার জন্যও তারা দায়ী। এবং উভয় কাজই হচ্ছে সুস্পষ্ট বড় কুফ্‌র, "অন্ধকারের ওপর অন্ধকার"। এসবই হচ্ছে (প্রচলিত ব্যবস্থায়) সন্তুষ্টচিত্ত এম.পি.-গণের এবং এর প্রতিপক্ষে ইসলামের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যের দাবীদার এম.পি.-গণের উভয়পক্ষের কুফ্‌র -এর পশ্চাতে কারণগুলোর ব্যাখ্যা। সত্যিই আমি জানতে পারলাম এ প্রতিপক্ষীয় এম.পি.-গণকে পার্লামেন্টে কার্যকালীন এর শপথ নিতে বলা হয়েছিল যাতে শাসনব্যবস্থা এবং আইন লংঘন না করার স্বীকৃতি বর্ণিত ছিল। তারা শপথ করল এবং এতে যোগ করল "তবে (আল্লাহ্‌র প্রতি) অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নয়"। কিন্তু এতে তারা কুফ্‌র -এর বাইরে থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে কুফ্‌র -এর সাথে একটি অতিরিক্ত সংযোজন। কারণ, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ধর্মকে খাট করা। আছারে [সাহাবায়ে কেরামের (রা.) বাণীতে] উল্লেখিত নিয়মে "তবে অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নয়" কথাটি শুধুমাত্র তখনই বলা যায়

[৭] (দাওয়াহ, গবেষণা ও ইফতা, সৌদী আরাবিয়াহ-র সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত- "The Islamic Research Magazine" ইস্যু নং-৭, পৃষ্ঠাঃ ১৭-১৮)।

যখন আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্ অনুযায়ী কোন মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট আনুগত্যের শপথ নেয়া হয়। সারকথা হচ্ছে শির্‌কের স্বীকৃতি প্রদানকালে তা অবশ্যই বলা যাবে না। অতএব মানবরচিত শাসন ব্যবস্থা ও আইনের আনুগত্য করার শির্‌কের স্বীকৃতি প্রদানকালে যে ব্যক্তি বলে "তবে অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নয়" এতদ্বারা সে সেই ব্যক্তির মতই আল্লাহ্‌র ধর্মকে খাট করল যে ব্যক্তি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মাসীহ যীশু হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পুত্র, "তবে অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নয়"। এসবই হচ্ছে এম.পি.-দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জনগণের মধ্যে যারা তাদেরকে (এম.পি.-দের) ভোট দেয় তারাও অনুরূপ কুফ্‌র -এ লিপ্ত। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে বাস্তবে জনগণই আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রভুত্বের শির্‌ক অনুশীলন করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে ওদেরকে (এম.পি.-দেরকে) প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এভাবে ভোটদাতাগণ এম.পি.-দেরকে শির্‌কের বাস্তবায়নের অধিকার দান করে এবং তাদের ভোটদানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ওদেরকে (এম.পি.-দেরকে) আইন প্রণয়নকারী রবের (প্রভুর) আসনে সমাসীন করে।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"সে [রাসূল (সা.)] তোমাদের আদেশ দেবে না যে, তোমরা ফেরেশতাদের এবং নবীদের নিজেদের প্রভু/রব সাব্যস্ত করে নাও। সে কি তোমাদের নির্দেশ দেবে কুফরীর, এ অবস্থায় যে, তোমরা মুসলিম?"*** (৩:৮০)

তাই যদি কোন ব্যক্তি ফেরেশতা এবং নবীদেরকে প্রভু/রব হিসেবে গ্রহণ করার কারণেও কাফির হয়ে যায় তাহলে যারা এম.পি.-দেরকে প্রভু/রব হিসেবে বরণ করে তাদের ব্যাপারে কি ফায়সালা হবে? অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতেও তা নিহিত রয়েছে:
"আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হল আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে রব (প্রভু) গ্রহণ না করে আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে।" (৩:৬৪)

ফলে আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষকে প্রভু/রব হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে শির্‌ক এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এম.পি.-দের ভোটদাতাগণ এ কাজটিই করে থাকেন।

অধ্যাপক সাইয়্যেদ কুতুব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পূর্বোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, "নিশ্চয়ই পৃথিবীতে সকল ব্যবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে একে অন্যকে প্রভু/রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। এটা চরম ক্ষয়িষ্ণু স্বৈরাচারী ব্যবস্থার ন্যায় পরম প্রগতিশীল গণতন্ত্রের ব্যাপারেও সত্য। নিশ্চয়ই রুবুবিয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের দ্বারা (আল্লাহ্‌র) উপাসনা করানোর অধিকার, ব্যবস্থা, চিন্তাধারা, শরীয়াহ্, আইন, মূল্যেবোধ এবং মানবদন্ডসমূহ প্রতিষ্ঠার অধিকার। কিন্তু পৃথিবীতে সকল ব্যবস্থায়ই কিছু লোক নিজস্ব দৃষ্টিভংগিতে এ অধিকারের দাবীদার হয়ে থাকে। এরূপ প্রত্যেক পরিবেশে শুধু একদল লোকই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বে থাকে। এ দলই অন্যান্যদেরকে তাদের আইন, মানদন্ড, মূল্যেবোধ ও ধারণার বশীভূত করে পৃথিবীতে প্রভুত্ব করে যাদেরকে কিছু লোক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়াতের দাবীকে অনুমোদন করে। এ কারণে তারা মূলত আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ওদেরকে (এম.পি.-দেরকে) উপাসনা করে, এমনকি যদিও তারা ওদেরকে (প্রকাশ্যে) সেজদা এবং রুকু করে না যেহেতু আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাসনা করা যায় না- তিনি সাইয়্যেদ কুতুব আরও বলেন, "এবং ইসলাম এ অর্থেই আল্লাহ্‌র ধর্ম/দ্বীন যেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রত্যেক নবী রাসূলের আগমন। বাস্তবিক আল্লাহ্ নবী-রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন মানব জাতিকে (তাঁর) দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র দাসত্বে নিয়ে আসার জন্য এবং (তাঁর) দাসদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের আওতাধীন করার জন্য।"

অতএব যে এ থেকে মুখ ফেরাবে সে আল্লাহ্‌র বিধানে মুসলিম নয়। এ ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভুল ব্যাখ্যা এবং পথভ্রষ্টদের বিপথে পরিচালনা ধর্তব্য নয়। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম।" (সাইয়্যেদ কুতুবের ফী যিলালিল কুরআন, ১/৪০৬/৪০৭) এ হচ্ছে ভোটদাতাগণের কুফ্‌র -এর দলীল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা।

আজকের সেক্যুলার পার্লামেন্ট (ধর্মহীন আইনসভা), যেখানে কুফ্‌র আইন প্রণয়ন করা হয়, অনুমোদন দেওয়া হয় এবং প্রকৃতপক্ষে পুনঃপ্রচেষ্টায় এগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয় তা মুশরিকদের মন্দির সদৃশ, যেখানে তারা তাদের দেবতাদেরকে বসায় এবং পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অতএব যে এম.পি. হিসেবে অংশগ্রহণ করে, ভোটদানের মাধ্যমে এম.পি. নির্বাচন করে অথবা মানুষের কাছে এগুলোর শোভা বৃদ্ধি করে এসব পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে সে কাফির।

নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর এসব আহকাম প্রয়োগ করতে হলে তা অবশ্যই এ কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (তাকফীর -এর নিয়ম)[৮] উল্লেখিত নিয়ম অনুসারে করতে হবে। এ প্রয়োগনীতির জ্ঞান বিস্তার করাও (ইসলামী) জ্ঞান ও দাওয়াতের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য বাধ্যতামূলক এ জন্য যে, যারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে তাদের সামনে যেন সুস্পষ্ট দলীল থাকে এবং যারা এ থেকে বাঁচতে চায় তাদের সামনেও যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! গণতন্ত্র ও আইনসভা (পার্লামেন্ট) হচ্ছে কাফিরদের এবং তাদের খাহেশের/প্রবৃত্তির ধর্ম। তাই এ ধর্মে প্রবেশ করে এবং একে অনুসরণ করে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হচ্ছে ইসলামের চৌহদ্দি থেকে বের হয়ে যাওয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"তারা যদি তোমাদের সন্ধান পেয়ে ফেলে তবে হয় তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে এবং এরূপ ঘটলেও কখনও তোমরা সাফল্য লাভ করবে না।"*** (১৮:২০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, ***"যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন সে জ্ঞান লাভের পর যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"*** (২:১৪৫)

শায়খ বিন বায নিজেই বলেন, এবং যখন আয-যুলুম (নিপীড়ন) চরমরূপে উল্লেখিত হয়, তা শির্ক আকবরকে বুঝায়। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম" (২:২৫৪) [মাজমু ফাতাওয়া, ইবনে বায, ২/১১০-১১১ এবং ১/১৭৯]।

অতএব, কাফির এবং মুরতাদদের ন্যায় নিজের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন না এবং এসব কুফ্‌র -এর আড্ডাখানার মাধ্যমে শরীয়াহ্ আইন প্রতিষ্ঠার আশা প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে বিপথগামী করার সুযোগ শয়তানকে দিবেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"সে তাদেরকে নানা প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশান্বিত করে। কিন্তু শয়তানের যাবতীয় প্রতিশ্রুতিই প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।"*** (৪:১২০)

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! অনুরূপ জেনে রাখবেন, গণতন্ত্র হচ্ছে আমেরিকার ধর্ম যে নিজেকে বিশ্বে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা বলে মনে করে। মার্কিন কংগ্রেস (পার্লামেন্ট) দেশে দেশে মার্কিন সাহায্য দানের জন্য সে সব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্তযুক্ত করে একটি আইন পাশ করেছে। এটা এ কারণে যে, গণতন্ত্র হচ্ছে আইনসংগত উপায়ে সে সব দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিনীদের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দানের অন্যতম সহজ পন্থা। আইনসভার সভ্যদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে এবং (নির্বাচনে) সাধারণ মানুষকে টাকার দ্বারা প্রলুব্ধ করে (নিজের পছন্দসই) নির্দিষ্ট লোকদেরকে এম.পি. হিসেবে বিজয়ী করার মাধ্যমে তা সংঘটিত হয়।
আমেরিকা অনেক আইনসভার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে বটে। যেমনঃ ১৯৪৭ সালে ইতালীর নির্বাচন। এ বছর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তার বিখ্যাত নীতি ঘোষণা করে যা কমিউনিস্ট পার্টিকে পরাজিত করে খৃস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টিকে বিজয়ী করার জন্য ৭০ মিলিয়নের অধিক ডলার আমেরিকার গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক ব্যয় করাকে জায়েয করেছিল। অধিকন্তু আমেরিকা সে সময়ে সাধারণ মানুষকেও বশ করেছিল যে জন্য সে গর্ব করে থাকে। ১৯৭৬ সালে আরেক দফা আমেরিকা ইতালীর নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে। তখন আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেট হেনরী কিসিনজার ইতালীর নির্বাচনে অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে তার বিখ্যাত নীতি ঘোষণা করে। (ড. ফয়েজ সালেহ আবু জাবর -এর, The Mordern Political History দার-আল-বাশীর সংস্করণ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩৪৬-৪১৪)

এ (গণতন্ত্র) হচ্ছে আমেরিকার ধর্ম, ইহুদী এবং খৃস্টানদের ধর্ম, যার ফাঁদে পড়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তাঁর (সা.) বাণী হচ্ছেঃ ***"তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরণ করবে। বিঘত বিঘত এবং একহাত একহাত করে অগ্রসর হবে। এমনকি তারা যদি সরীসৃপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তাহলে তোমরাও তাদেরকে অনুসরণ করবে।" তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম রা.) জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.), আপনি কি ইহুদী ও খৃস্টানদের কথা বুঝাচ্ছেন? তিনি (সা.) বললেন, তাদের ছাড়া আর কার কথা হবে?"*** *(সহীহ বুখারী এবং মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত)*

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! মুসলিমদেরকে ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) শাসক এবং অন্যান্য কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অবশ্য কর্তব্য থেকে ভিন্নমূখী করার জন্য একটি নিকৃষ্ট ধোঁকা ছাড়া এ গণতন্ত্রের দোহাই আর কিছুই নয়। এভাবে মানুষ জাতীয় শয়তানগুলো

[৮] তাকফীর -এর ব্যাপারে পরর্তিতে (পৃষ্ঠা ৪১-এ) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(আমাদের কাছে) এসে বলে: "ভোটের বাক্সগুলোতেই যেখানে সমস্যার সমাধান রয়েছে তাহলে আর জিহাদ এবং কষ্টের পথে কেন যাবে? শরীয়াহ্ অনুযায়ী যা তোমাদের ওপর কর্তব্য তাতো হলো ভোটের বাক্সে গিয়ে একখানা ব্যালট পুরে আসবে। আর বাস্তবিক শায়খ বিন বায -এর অনুমতি দিয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু এবারে যদি জিততে নাই পারো পরের বারে তো জিতবে।"

এভাবে ভোটের বাক্সের ফলাফলের অপেক্ষায় মানুষ তাদের জীবন কাটাতে থাকবে। নিঃসন্দেহে এ শয়তানী পথে সবচেয়ে ভাগ্যবান হয় তাগুতের দল (মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী) যারা তাদের বিভিন্ন নমুনার মধ্যে একটি হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে কতিপয়কে পার্লামেন্টে প্রবেশের অনুমতি দেয় একমাত্র মুসলিমদেরকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। বাস্তবিক শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র.) তাঁর "মিনহাজুস সুন্নাহ্ নববীয়া" গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, শওকা (অর্থাৎ শক্তি) সম্পন্ন লোকদের আনুগত্যের দ্বারা ইমামত প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপ আমাদের যুগেও শওকা, অর্থাৎ শক্তি ব্যতীত কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। অতএব পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইসলামপন্থী হওয়ার দাবীদারকগণকে কয়েক লক্ষ মানুষের ভোট দানে রোমাঞ্চিত হওয়া ঠিক নয়। নিশ্চিতভাবেই এসব লোকদেরকে যদি ইসলামী শাসন জারী করার উদ্দেশ্যে বাহু উত্তোলন করতে এবং জিহাদ পরিচালনা করতে বলা হয় তাহলে তারা পলায়ন করবে। সুতরাং কাফির শাসকদের বিরুদ্ধে এসব লোকের কোন শক্তি অথবা বলিষ্ঠ সৈন্যদল কি আছে? শক্তির অধিকারীরাই রাষ্ট্রের অধিকারী হয় আর শক্তি সৃষ্টি হয় লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্রের সমন্বয়ে, তারপর অতিরিক্ত সাহায্য।

পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফলাফল মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয় যা (শরীয়াহ্‌র) বৈধ প্রমাণের ভিত্তিতে তো দূরের কথা এমনকি শক্তির ওপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। অধিকন্তু পার্লামেন্ট এবং নির্বাচনশুদ্ধ গণতন্ত্র একটি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয় যা ইসলামী (কাজের) সামর্থ্যকে ঘুম পাড়ানীর কাজ করে এবং এটি এমন একটি স্টেশন যা তাগুতের সিংহাসন থেকে (ইসলামের এ) ক্ষমতাগুলোকে বিনষ্ট করে।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"আর তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত; যদিও তাদের ষড়যন্ত্র মারাত্মক ছিল, (তবুও) তা পর্বতসমূহও (আসল পর্বত অথবা ইসলামী শরীয়াহ্) টলিয়ে দেয়ার মত হবে না।"*** (১৪:৪৬)

সকল প্রকার কাফিররাই এখন গণতন্ত্রের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছে যতক্ষণ তা তাদের খাহেশ মিটিয়ে থাকে। কিন্তু একদা যখন তা তাদের স্বার্থের বিপরীতে যাবে তখন তারাই প্রথম একে ধ্বংস করবে। এরা হচ্ছে ঐ কাফিরের তুল্য যে নিজের (হাতে গড়া) মূর্তিকে (দীর্ঘকাল উপাসনা/ইবাদত করে) সেকেলে করে, কিন্তু যখন সে ক্ষুধার্ত হয় তখন নিজেই নিজের খোদাকে ভক্ষণ করে যাকে সে উপাসনা/ইবাদত করত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এর অসংখ্য নজীর রয়েছে।

মুসলিম ভাইসব, শেষ কথা হচ্ছে, এম.পি.-রা সে সব ব্যক্তি যাদের মানুষের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার রয়েছে এবং বাস্তব অর্থে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের উপাসনা করা হয়ে থাকে; আর যারা তাদেরকে ভোট দেয় তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তাদের প্রভু (রব) নিয়োগ করে। সুতরাং এ কাজের দ্বারা উভয়পক্ষই কাফিরে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"আপনি বলে দিন : হে আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হল আমরা যেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই যেন তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে রব (প্রভু) গ্রহণ না করে আল্লাহ্কে ত্যাগ করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিম'।"*** (৩:৬৪)

অতএব, আইনসভায় (পার্লামেন্টে) প্রবেশ করা অথবা এর সদস্য (এম.পি.) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অনুমোদন যোগ্য নয়।

নিশ্চয়ই এটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রার্থী হয়েই হোক কিংবা ভোট দিয়েই হোক, এসব পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ কুফ্‌রে আকবর। অধিকন্তু যদি আমরা ঠিকই বলে থাকি যে, শরীয়াহ্‌র সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে নিয়্যত দ্বারা পাপ কাজ কখনো অনুমোদনযোগ্য হয় না, তাহলে (জেনে রাখতে হবে) কুফ্‌র মা'আসী (লঘু পাপ) থেকে কঠোরতর এবং বৃহত্তর। ফলে তা নিয়্যত, প্রয়োজন কিংবা মাসলাহ (ইসলামের উপকারে), কোনটির দ্বারাই অনুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। এটা এ কারণে যে, এমন কি যদি এর বৈধ শর্তসমূহও পরিপূর্ণ হয় তথাপি মাসলাহাহ-র প্রয়োজন হওয়ার মানে হচ্ছে ইজতিহাদ, আর ইসলামী আইনের মূল পাঠের (অর্থাৎ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের) উপস্থিতিতে কোন ইজতিহাদ হতে পারে না।

বাস্তবিক কতিপয় কাফির দাবী করত যে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করার নিয়্যতে ও লক্ষ্যে কুফ্‌র করত। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের এ বক্তব্য প্রত্যাখান করেন এবং তাদেরকে কাফির ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন। কারণ, যদি তারা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার নিয়্যত পোষণ করত তাহলে তারা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নির্দেশিত পথেই তা করত এবং তাঁর

নিষিদ্ধ পথে তা করত না। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে: ***"যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে 'আউলিয়া' (রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী) হিসেবে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।"*** (৩৯:৩)

বিন বায নিজেই বলেন, আর প্রকৃতপক্ষে কিছু মুশরিকের দাবী ছিল, নবী ও ধার্মিক লোকদের উপাসনা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত মূর্তিগুলোকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার পিছনে তাদের নিয়্যত ছিল নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি পৌঁছানো এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের ওকালতি লাভ করা। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা প্রত্যাখান করেন এবং তাদের যুক্তি খন্ডন করেন এ বাণীতে, আর তারা উপাসনা করে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন বিষয়ে অবহিত করছ যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে, যাকে তোমরা শরীক করছ।" (১০:১৮) অতঃপর তিনি সূরা আয-যুমারের উল্লেখিত আয়াতের উদ্ধৃতি দেন। (মাজমু আল-ফাতাওয়া, ইবনে বায, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮)

অতএব বিষয়টি ঠিক সে ব্যক্তির মত যে পার্লামেন্টে প্রবেশ করে এবং বলে যে তার নিয়্যত হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেওয়া; সে একজন মিথ্যাবাদী এবং কাফির এমন কি যদি সে তার শির্‌ককে আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের উদ্দেশ্যেও আখ্যায়িত করে থাকে। বাস্তবিক হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, "নাম এবং আকৃতিসমূহে পরিবর্তনের কারণে যদি রায় এবং (শরীয়াহ্‌র) বাস্তবতার পরিবর্তন বাধ্যতামূলক হত তাহলে নিশ্চয়ই ধর্ম বিকৃত হয়ে যেত, বিধিবিধান সমূহ পরিবর্তিত হত এবং ইসলাম অন্তর্হিত হয়ে যেত। তাই মুশরিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে খোদা আখ্যায়িত করে কি লাভ করল যেখানে তাদের (খোদাদের) মধ্যে উলুহিয়্যাহর গুণ এবং এর কোন বাস্তবতার বিদ্যমান নেই? এবং শির্‌ককে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া আখ্যায়িত করেই বা তারা কি ফল পেল? তিনি আরও বলেন, অতএব, এসব লোককে আমরা অবশ্যই পাঠ করে শুনাব: ***"এগুলো তো নিছক নাম মাত্র, যা (মিছেমিছি) সাব্যস্ত করে নিয়েছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা; আল্লাহ্ তো এর কোন প্রমাণ নাযিল করেননি"***। (সূরা আন-নজম ২৭:২৩)[৯]

এতদ্বারা শায়খ বিন বাযের ফতোয়াটি ভুল। তাই এ হিতকর মন্তব্যটি গ্রহণ করুন যা অবশ্যই আপনাকে দৃঢ়ভাবে পালন করতে হবে, আর তা হচ্ছে, "*একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত নিয়্যতের কারণে পাপ কাজ কখনো অনুমোদিত হয় না।*"

আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (র.) তাঁর পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যে বলেন, "তাই অজ্ঞ লোকের অবশ্যই বুঝা এবং মনে করা উচিত নয় যে, রাসূল (সা.)-এর বাণী: "কর্মসমূহ নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল" - এর ব্যাপকতার জন্য (ভাল) নিয়্যতের দ্বারা পাপ কখনো সওয়াবে রূপান্তরিত হতে পারে। অতঃপর তিনি বলেন, এসবই হচ্ছে অজ্ঞতা। আর নিয়্যতের প্রভাবে অত্যাচার, আগ্রাসন ও পাপ বাতিল হয় না। সারকথা, শরীয়াহ্‌র দাবীর বিপরীত অসৎ উপায়ে ভাল কাজের নিয়্যত করার অর্থ হচ্ছে আরেকটি অসৎ কাজ করা। তাই এ (অসৎ উপায়) সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি হলে শরীয়াহ্‌র বিবেচনায় সে অবাধ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু যদি (অবচেতনভাবে) এড়িয়ে যায় তাহলে অজ্ঞতার জন্য গুনাহগার হবে। (য়াহ্ইয়া উলুমুদ্দীন)

যা-ই হোক, যদি আমি উল্লেখ করে থাকি যে, পাপ কাজ ভাল নিয়্যতের কারণে অনুমোদিত হয় না, তবে সুনির্দিষ্ট বৈধ প্রমাণ থাকলে ভিন্ন কথা- তা সকল পাপের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কারণ, কতগুলো নিষিদ্ধ জিনিস কোন অবস্থায়ই অনুমোদিত হয় না; যেখানে অন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দ্বারা কোন কোন উপলক্ষে অনুমোদিত হয় আবার কোন কোন সময় হয় না। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ দু'প্রকারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যগুলো তুলে ধরেছেন, "তাদের একটি হচ্ছে সে সব জিনিস যেগুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনেই হোক কিংবা নাই হোক, নিশ্চিতভাবেই শরীয়াহ্‌র কোন কিছুর অনুমতি দেয়নি।" যেমন- শির্‌ক, আল-ফাওয়াহিশ (অসৎ কাজসমূহ), না জেনে আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু বলা এবং অন্যায়-অত্যাচার। এ চার প্রকার জিনিসই আল্লাহ্‌র বাণীতে উল্লেখিত হয়েছে:
"আপনি [হে মুহাম্মদ (সা.)] বলে দিন, আমার প্রভু কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন (সকল প্রকার) গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা যার কোন দলীল/প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।" (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

তাই সকল শরীয়াহ্য় এ জিনিসগুলো নিষিদ্ধ ছিল। অধিকন্তু এগুলোকে নিষিদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ সকল নবী, রাসূলকে (আ.) পাঠিয়েছিলেন এবং কোন অবস্থাতেই তিনি এগুলোর কোনটির অনুমতি দেননি। তাই এ আয়াতখানা মাক্কী সূরায় নাযিল

---

[৯] ইলাম-উল-মুআক্কীন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩০।

হয়েছিল। তাদের (অর্থাৎ উপরোল্লিখিত চারটি নিষিদ্ধ জিনিসের) পাশাপাশি অন্যান্য জিনিসগুলোর নিষিদ্ধতা (এর আদেশ) আসেনি। কারণ, এগুলোকে তিনি আরো পরে নিষিদ্ধ করেন। যেমন- রক্ত, মৃত প্রাণী, শুকরের মাংস, যেগুলো বিভিন্ন উপলক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু অন্য কতগুলো ক্ষেত্রে নয়। তাই নিষিদ্ধতার আদেশটি অসীম ছিল না।

অধিকন্তু (গলায় আটকানো) কাঁটা খোলার জন্য সর্বসম্মতভাবে এবং তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের দু'টি মতের একটি অনুযায়ী মদ (পান করা) অনুমোদিত। তৃষ্ণার ব্যাপারে যারা অনুমতি দেননি তারা বলেন, "যথার্থ অর্থে তা তৃষ্ণা নিবারণ করে না।" এবং এটাই ছিল (ইমাম) আহমদের যুক্তি। এ ব্যাপারে বিষয়টি নির্ভর করে (মদ দ্বারা) তৃষ্ণা নিবারণ হয় কিনা তার ওপর। তাই যদি জানা যে, তৃষ্ণা নিবারণ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা অনুমোদিত। একই প্রমাণ দ্বারা ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুকরের মাংস হালাল। তৎসত্ত্বেও যে তৃষ্ণায় কেউ মৃত্যুবরণ করবে বলে মনে করে সে তৃষ্ণার প্রয়োজন ক্ষুধার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক এবং এ কারণেই (এমতাবস্থায়) নাপাক দ্রব্য পান করার অনুমতি তর্কাতীত। তবে তা শুধুমাত্র তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, অন্যথায় এর সামান্য কিছুরও অনুমতি নেই।" (মাজমু আল-ফাতাওয়া, ১৪/৪৭০-৪৭১)

যেহেতু আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষকে আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার বাস্তবতার জন্য এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, গণতন্ত্র হচ্ছে শির্ক আকবর (বড়), তাই ইবনে তাইমিয়্যাহ (র.) বক্তব্য অনুযায়ী সে শির্কে হচ্ছে সুনিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ জিনিস যা প্রয়োজন, অপ্রয়োজন কিংবা মাসলাহাহ (উপকার), কোনটির জন্যই কখনো অনুমতি পেতে পারে না। ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রকৃতই বলেনঃ "কিন্তু এ জিনিসগুলো চারটি প্রকারের (নিষিদ্ধ জিনিসের) জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য নয়। কারণ শির্ক, না জেনে আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু বলা, প্রকাশ্য কিংবা গোপনেকৃত আল-ফাওয়াহিশ এবং অন্যায় অত্যাচারের সাথে মাসলাহাহ-র কোন সম্পর্ক নেই।"

বৈধ শর্তানুসারে ইকরাহ (মৃত্যুর হুমকি দ্বারা কুফ্র কাজ বা কথা বলতে বাধ্য করা) ব্যতীত সকল পাপের ব্যাপারে এরূপই হচ্ছে নিয়ম, হোক তা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষে অনুমোদিত কিংবা চির অনুমোদিত পাপ।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োজনের খাতিরে শির্কের পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের অনুমতির ব্যাপারে। অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাও শায়খ বিন বাযের অনুসরণ করেন। এরূপ অনুসরণ নিষিদ্ধ ও মাদমুম (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র বিরোধিতা)। তাঁদের (পন্ডিতগণের) অন্যতম যিনি এ বিষয়ে বিন বাযের অনুসরণ করেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর সফর আলী হাওয়ালী (২৩/০৬/১৪১২ হিজরী তারিখের ভাষণ, দামানে আল-হিদায়া আল-ইসলামিয়াহ-র রেকর্ডকৃত টেপ নং ৪৬৬১)। দু'টো কারণে আমি বিশেষভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করলাম। প্রথমতঃ তিনি মানুষকে আক্বীদাহ শিক্ষা দেন এবং শির্ক ও এর প্রকারভেদ সম্পর্কে সচেতন। দ্বিতীয় তিনি 'সেক্যুলারিজম'-এর ওপর একখানা কিতাব লিখেছেন যাতে তিনি গণতন্ত্রের উৎস এবং এর শির্ক হওয়ার বাস্তব প্রমাণ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। অতএব এ অন্ধ অনুসরণ যা মাদমুম এবং যা হচ্ছে আইনের মূল ভাষ্যের বিপরীত অনুসরণ করা -এতে পতিত না হওয়ার জন্য সকলের মধ্যে তিনিই ছিলেন অধিক যোগ্য।

এখানে তাঁর 'সেক্যুলারিজম' নামক কিতাবের গণতন্ত্র সম্পর্কিত কিছু আলোচনা এসে পড়ে।

ডক্টর আল-হাওয়ালী বলেন, "ভুল ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন ব্যবস্থা, পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত অবস্থা, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কুফ্র এবং জাহেলিয়াত আখ্যায়িত করেছেন সেগুলোকে বিশেষত : সেক্যুলার (ধর্মহীন) এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এ ছুতার ওপর ভিত্তি করে কুফ্র ও জাহেলিয়াত আখ্যায়িত করাকে জটিল মনে করা যে, এগুলো আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না অথবা কতগুলো ইবাদতকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেয় না এবং সেক্যুলার ব্যবস্থার কতিপয় অনুসারী শাহাদাহ (ঈমানের সাক্ষ্য) উচ্চারণ করে, নামায, রোজা, হজ্জের মতো কোন কোন ইবাদতের অনুশীলন করে, আলেম (!!) এবং ইসলামী সংস্থা সংগঠনকে দান ও সম্মান করে, ইত্যাদি। এমতাবস্থায় কিভাবে আমরা সেক্যুলারিজমকে জাহেলিয়াত এবং এতে বিশ্বাসীকে জাহিল (অজ্ঞ/মূর্খ) বলতে পারি? কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, যে ব্যক্তি এ রকম ভুল ধারণা প্রকাশ করে সে মূলত লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কিংবা ইসলামের অর্থই জানে না। এ হচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের সুধারণাকে কাজে লাগানো। তবে তা (সাধারণ লোকের ভাল ধারণা) এ কারণগুলোকে ব্যবহারকারী অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ব্যাপারে (প্রযোজ্য হওয়া) অনুমোদিত নয়।" (ড. সফর আল-হাওয়ালীর 'সেক্যুলারইজম', পৃষ্ঠা ৬৮৭)

সফর আল-হাওয়ালী আরো বলেন, "প্রকৃত কাফিরদের (অর্থাৎ যে ইতিপূর্বে কখনো মুসলিম ছিল না) বিদ্রোহের চেয়ে মুরতাদদের ধর্মদ্রোহীতা মারাত্মক- তাদের বিরুদ্ধে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ'র এ বক্তব্যের ওপর সামান্য চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের জন্য (এখন) খুবই সময়োপযোগী। ইহুদী-খ্রিস্টান ষড়যন্ত্রকারীরা এ বিষয়টিকেই যে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে, সেভাবে তা পূর্বে যুয়াইমারের (একটি অখ্যাত খ্রিস্টান মিশনারী এবং ইসলামের ঘোর শত্রু) উপদেশে উল্লেখিত হয়েছে, তা তাদেরকে (অর্থাৎ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত সাধারণ লোকদেরকে) বলতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্রকারীরা

মুসলিমদেরকে তাদের ধর্মের গন্ডি থেকে বের করে নাস্তিক্যবাদী এবং বস্তুবাদী পথে (তাদেরকে টেনে) আনার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অতএব তারা গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন পরিত্যাগকারী শাসনব্যবস্থা তৈরী এবং (অতঃপর) একই সাথে মুসলিম হওয়ার ও আকীদাহকে সম্মান করার পন্থা অবলম্বন করেছে। ফলে তারা মানুষের সংবেদনশীলতাকে ধ্বংস করেছে, নিজেদের সাথে তাদের (মুসলিমদের) বন্ধুত্বকে নিশ্চিত করেছে এবং তাদের নীতিবোধকে নিস্তেজ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্র শরীয়াহ্র উচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছে এবং নিজেদের উত্থানকে নিরাপদ করেছে। এর দরুন এ পদ্ধতিসমূহের প্রভুরা নিজেদের নাস্তিক্য কিংবা ধর্মহীনতার কথা স্বীকার করতে সাহস করে না। অপরপক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তারা গর্বের সাথে স্বীকার করেছে যে, তারা গণতন্ত্রী।"[১০]

তাঁর এ আলোচনা সত্ত্বেও বিন বাযের ফতোয়া অনুসরণ করা কি তাঁর জন্য সঠিক হলো? এ প্রসঙ্গে, যারা মানুষের নিকট ফতোয়া প্রদান করেন- তাদের পদমর্যাদা যাই-ই হোক না কেন- তাঁরা যে বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন তার পরিবেশ সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন থাকার জন্য উপদেশ প্রদানের সুযোগটি আমি হারাতে চাইনি। যাতে তাঁরা শির্কী গণতন্ত্রকে ***"আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত"*** -এর মোড়কে উপস্থাপনকারীদের ন্যায় কুৎসিত বিষয়কে সুন্দর পোষাকে সজ্জিতকারী প্রশ্নকারীদের (ফতোয়া তলবকারী) দ্বারা প্রবঞ্চিত না হন। যে বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করা হবে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকা অবশ্যই মুফতী হওয়ার শর্তাবলীর অন্যতম। যেমনঃ ইবনুল কাইয়্যিম "আহকাম আল-মুফতি" চুয়াল্লিশতম নির্দেশিকায় বলেনঃ "যখন কর্তব্য কাজের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পাওয়া, অবৈধ কোন জিনিসকে বৈধ করা, প্রতারণা বা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করার সাথে কোন বিষয় জড়িত বলে ধারণা হয় তখন (ফতোয়া) জিজ্ঞাসাকারীকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা, তার লক্ষ্য হাসিলের জন্য পথ প্রদর্শন করা কিংবা জিজ্ঞাসাকারী যাতে মনের খাহেশকে পরিপূর্ণ করতে পারে এমনভাবে (বিষয়টির) বাহ্যিক অবস্থানুযায়ী ফতোয়া প্রদান করা তাঁর (মুফতি) জন্য হারাম। বরং তাঁকে লোকদের প্রতারণা, শঠতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে এবং তাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা ঠিক হবে না। অধিকন্তু মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে সতর্ক, দক্ষ ও ওয়াকিফহাল থাকা উচিত এবং শরীয়াহ-য় তাঁর ফিকহ-এর ওপর মজবুত দখল থাকা উচিত। কিন্তু যদি তিনি এরূপ না হন তাহলে তিনি নিজেকে ও অন্যান্যদেরকে বিপথে পরিচালিত করবেন। অনেক বিষয়েরই বাহ্যিক রূপ সুন্দর বলে মনে হয় অথচ এগুলোর অভ্যন্তরে (বাস্তবে) রয়েছে ষড়যন্ত্র, প্রবঞ্চনা ও নিপীড়ন।"

তাই অনভিজ্ঞ (মুফতি) শুধু এগুলোর বাহ্যিক দিকটি অবলোকন করে বৈধতার সিদ্ধান্ত দেন। অপরপক্ষে গভীরভাবে উপলব্ধিকারী (মুফতি) এগুলোর লক্ষ্য এবং আভ্যন্তরীন (বাস্তবতা) সমালোচনা করেন। এভাবে প্রথম জনের কাছে বিষয়টির মিথ্যাপূর্ণতা অনাবিস্কৃত থাকে ঠিক, যেরূপ মুদ্রা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের কাছে জাল মুদ্রা অপেক্ষা অলক্ষ্যে থাকে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন এগুলোর মিথ্যা হওয়াকে এমনভাবে আবিষ্কার করেন যেভাবে মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তি জাল মুদ্রাকে বাছাই করেন। অধিকন্তু অনেক মিথ্যা জিনিস এমন লোকের দ্বারা প্রকাশিত হয় যে তার সুন্দর বক্তব্য এবং ভন্ডামীর দ্বারা তা সত্যরূপে জাহির করে। একইভাবে কোন লোক অনেক সত্য জিনিসকে তার খারাপ প্রকাশভংগি দ্বারা অসৎ রূপ দিয়ে মিথ্যা হিসেবে প্রকাশ করে থাকে। তাই যার সামান্যতম বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে সে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে এরূপ। আর সংখ্যায় ও খ্যাতিতে (এ অবস্থাদি) বিরাট হওয়ার জন্য এর কোন উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আসলে যে এসব মিথ্যা বক্তব্য ও বিদ'আতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-বিবেচনা করে সে দেখতে পায় যে, যারা এগুলোকে প্রকাশ করে, সুন্দর ছাঁচে উপস্থাপন করে এবং বিভিন্ন শব্দের দ্বারা ঢেকে রাখে তা তাদের কাছেই গৃহীত হয় যারা এগুলোর প্রকৃত তত্ত্ব অবহিত নয়।" (ইলাম-উল-মুওয়াক্বীক্বীন, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৯-২৩০)

---

১০ 'সেক্যুলারইজম', জমিয়ত উম্মুল কুরা সংস্করণ, ১৪০২ হিজরী, পৃষ্ঠা ৬৯২-৬৯৩।

তাকফীর সংক্রান্ত কিছু মৌলিক আলোচনা

তাকফীর -এর যে নিয়মের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন এবং কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে তাকফীর প্রয়োগের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম নীতি তা লেখকের যে কিতাব থেকে গণতন্ত্র সংক্রান্ত এ অধ্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে সে একই কিতাবে সংজ্ঞায়িত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আযীয তাঁর কিতাব "আল-জামি'আ ফী তালাবিল ইল্ম-ই শরীফ", ৪৮৫ পৃষ্ঠায় বলেনঃ "এ দুনিয়ার নিয়মে, যা মানুষের বাহ্যিক দিকে প্রযোজ্য, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার দ্বারা কৃত বা কথিত কোন কুফর শরীয়াহ্ কর্তৃক প্রমাণিত হলে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হয় - যদি বিচারের শর্তাবলী পূরণ হয় এবং বাধাগুলো (যে সব জিনিস তাকফীর প্রয়োগে বাধা দেয়) তার ব্যাপারে অপরিপূর্ণ থেকে যায়; আর ফতোয়াদাতাকে অবশ্যই (ইসলামের নিয়মানুযায়ী) রায় দানের উপযুক্ত হতে হবে। অতঃপর আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করিঃ

(১) যদি সে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ তার শাস্তি প্রয়োগের আগে তাকে তওবা করতে বলা বাধ্যতামূলক।

(২) যদি সে ব্যক্তি এমন একজন বিদ্রোহী হয় যে কোন সশস্ত্র গ্রুপ অথবা (ইসলামের সাথে) যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষিত হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির তাকে হত্যা করার এবং তাকে তওবার আহ্বান জানানো ছাড়াই তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি রয়েছে। আর এর ফলে যে উপকার এবং অপকার হতে পারে তা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। কিন্তু যখন সেগুলো (অর্থাৎ উপকার ও অপকার) বিরোধিতার সম্মুখীন হন তখন অধিকতর শক্তিশালী মতামতটি প্রাধান্য পাবে।"

এ নীতি ব্যাখ্যার পর শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আযীয যে সব বাধা একজন ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করতে প্রতিরোধ করে সেগুলো উল্লেখ করেন। ৪৯৭-৪৯৮ পৃষ্ঠায় এরূপ বলেনঃ

(ক) বলার দোষে সৃষ্ট ভুল। কোন ব্যক্তি (অন্তরের) ইচ্ছা ব্যতীত কুফ্রী কথা বলে থাকতে পারে। এ বাধাটি ইচ্ছের শর্তকে বাতিল করে দেয়। যেমন, কোন মুকাল্লাফ ব্যক্তির (ইসলামানুসারে দায়িত্বশীল এবং এর ফলে তার বিশ্বাস, কথা ও কাজ বিবেচনাযোগ্য) ইচ্ছাকৃত কুফর। ভুল করাকে বাধ্য হিসেবে বিবেচনার ব্যাপারে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ ***"তোমাদের কোন ভুল হলে কোন গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা।"*** (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫)

এ সম্পর্কে তাকফীর প্রয়োগ হওয়ার ব্যাপারে সে লোকটি সম্পর্কিত হাদীসই হচ্ছে প্রমাণ যে তার রাহিলা (যে উটের ওপর তার খাদ্য, পানীয় এবং আশ্রয় বহন করছিল এবং তা মরুভূমির মাঝখানে সংঘটিত হয়েছিল) হারিয়েছিল, তারপর তাকে খুঁজে পেয়ে বললঃ "হে আল্লাহ্! তুমি আমার দাস আর আমি তোমার প্রভু।" এ হাদীসে রাসূল (সাঃ) বর্ণনা করেন, আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করেছিল।" হাদীসটি সর্ববাদী সম্মত।

(খ) আত-তাআওউল -এর ক্ষেত্রে কৃত ভুল। ইজতিহাদ কিংবা বৈধ দলিল প্রমাণের ভুল অর্থ অনুধাবন থেকে উদ্ভূত ভুল ধারণার কারণে বৈধ দলিল-প্রমাণকে তার সঠিক জায়গার পরিবর্তে অন্য জায়গায় স্থাপন করা হচ্ছে তাআওউল। তাই মুকাল্লাফ যার অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন সে দলিল প্রমাণ ব্যবহার করে যে কুফর করেন তা কুফর -এর সাথে সম্পর্কিত নয়। তদনুসারে (কুফর-এর) ইচ্ছার শর্ত ভুল দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। তদ্রুপ তাআওউল -এর ক্ষেত্রে কৃত ভুল তাকে কাফের সাব্যস্ত করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবে যদি কুফ্র এর বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় অথচ সে তাতে অটল থাকে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

এর প্রমাণ হচ্ছে ক্বাদামা বিন মাদগুণ -এর ঘটনা- আর আমি অবশ্য আল-আকীদাহ-আত-তাহাউয়া-র ওপর আমার মন্তব্য প্রসঙ্গে সতর্ক বাণীতে তা উল্লেখ করিছি- যেখানে ক্বাদামা আল-লাহর এ বাণী দ্বারা প্রমাণ করে মদ্য পানকে হালাল করেছিলেন- এবং তা হালাল করা হচ্ছে কুফ্রঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের কোন গুনাহ নেই পূর্বে তারা যা খেয়েছে সেজন্য, ..." (৫:৯৩)

তিনি উমারের (রাঃ) কাছে এ দলিল পেশ করলে উমার (রাঃ) তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। তদনুসারে উমার (রাঃ) তার ভুল দেখালেন এবং তাকে শাস্তি দিলেন (অর্থাৎ মদপানের জন্য তাকে বেত্রাঘাত করলেন, অন্যথায় এটাকে হালাল করার শাস্তি হচ্ছে প্রাণদন্ড, কেননা তা ধর্মত্যাগের শামীল)। ইবনে তাইমিয়্যাহ (র.) বলেন, "অথবা যারা (মদকে হালাল করার) ভুল করছিলেন তাদের মত তিনি একটু ভুল করেন এবং মনে করেন ঈমানদার ও সৎকর্মশীলগণ মদ পানের অবৈধতা থেকে

স্বাধীন। তবে উমার (রাঃ) তাদেরকে তওবার সুযোগ দেন। এ ধরনের লোকদেরকে অবশ্যই তওবার কথা বলতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে দলিল-প্রমাণ তুলে ধরতে হবে। কিন্তু যদি তারা এর ওপর অটল থাকে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। তবে এর পূর্বে তারা অবশ্যই কাফির সাব্যস্ত হবে না, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ক্বাদামা বিন মাদগুণ এবং তাঁর সংগীগণকে কাফির সাব্যস্ত করেননি যখন তারা আতাওউল -এর ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন।" (আল-ফাতাওয়া ৭/৬১০)

প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের (রা.) ইজমার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, তাআওউল -এর ক্ষেত্রে কৃত ভুল তাকফীর -এর ব্যাপারে একটি বাধা। অধিকন্তু এটা আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীর সাধারণ অর্থের অন্তর্গত:
"তোমাদের কোন ভুল হলে তাতে গুনাহ নেই।" (৩৩:৫)

তথাপি তাআওউল -এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভুলই গৃহীত কৈফিয়ত হিসেবে এবং তাকফীর -এর বাধ্য হিসেবে বিবেচিত নয়। আইনগত মূল পাঠের (অর্থাৎ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের) ওপর গভীর চিন্তা-ভাবনা থেকে উদ্ভুত কিন্তু বোঝার ক্ষেত্রে কৃত ভুলই শুধু তাআওউল -এর ভুলের কৈফিয়ত হিসেবে গৃহীত হয়। বিপরীতপক্ষে, আইনগত মূল পাঠ থেকে গৃহীত তথ্য ব্যতিরেকে নির্জলা নিজের ইচ্ছা ও মতামত থেকে উদ্ভুত তাআওউল -এর ভুল কৈফিয়ত হিসেবে গৃহীত নয়, যেমন আদমকে সেজদা করা থেকে বিরত থাকার প্রমাণ হিসেবে ইবলিস বলেছিল:
"আমি তাঁর থেকে উত্তম, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা তৈরি করেছ আর তাঁকে তৈরি করেছ মাটির দ্বারা।" (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৬)।

এটা কেবল (নিজের ধারণার ভিত্তিতে প্রদত্ত) একটি অভিমত। ঠিক বাতিনীয়াদের (একটি কুফর সম্প্রদায়, যেমন ইসমাইলীগণ) তাআওয়িল-সমূহের ন্যায়, যেগুলোর দ্বারা তারা আইনগত অবশ্য কর্তব্য কাজগুলো বাতিল করেছে। আর তা হচ্ছে কেবল ইচ্ছার ভিত্তিতে। সকল ব্যাপারে তাআওয়িল (যে ব্যক্তি তাআওউল-এ ভুল করে) -এর বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাধ্য হওয়াকে নিবৃত্ত করে।

(গ) অজ্ঞতার বাধা: এটা হচ্ছে কোন মুকাল্লাফ -এর কোন কুফ্‌রকে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে যাওয়ার ফলে সংঘটিত কুফ্‌র। তাই তাঁর অজ্ঞতা (শরীয়াহ্ কর্তৃক) বিবেচিত হওয়ার শর্তে তার ওপর তাকফীর প্রয়োগে আমাদেরকে বাধা দেয়। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

"... কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দেই না।" (সূরা আল-ইসরা ১৭:১৫)

অতএব, বার্তা গ্রহণ করার পর ব্যতীত এ পৃথিবীর জীবনে অথবা আখিরাতে কোথাও (তাদের) কোন শাস্তি নেই। আমি অবশ্য আগে এ কিতাবের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিষয়টি সম্পর্কে একটি গবেষণা করে দেখিয়েছি যে, কৈফিয়ত হিসেবে বিবেচিত অজ্ঞতা (জাহল) হচ্ছে যে অজ্ঞতার মূলোৎপাটনে নিজের অথবা জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত কারণে মুকাল্লাফ অসমর্থ। তবু তিনি যদি জ্ঞান অর্জন ও অজ্ঞতা দূরীকরণে সমর্থ হন কিন্তু তা না করেন তাহলে যতদূর (শরীয়াহ্‌র) বিধান সংশ্লিষ্ট তিনি অজ্ঞতার কৈফিয়তের যোগ্য নন এবং একজন জাননেওয়ালা হিসেবে বিবেচিত হবেন, যদিও বাস্তবে তিনি জাননেওয়ালা না হয়ে থাকেন।

(ঘ) ইকরাহ-র (কুফর করতে বা বলতে বাধ্য হওয়া) বাধা। এর বিপরীত অবস্থা হচ্ছে যখন মুকাল্লাফ তার কাজ (নিজে) পছন্দ করেন। ইকরাহ তাকফীর প্রয়োগে বাধা হওয়ার দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী:

"যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফ্‌র -এর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়।" (সূরা আন-নাহল ১৬:১০৬)

কিন্তু কুফর করতে বাধ্য হওয়ার বৈধতার অবস্থা বিবেচিত হবে যদি হত্যা বা কেটে ফেলার হুমকি জড়িত থাকে কিংবা মুকাল্লাফ কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হয়। এ হচ্ছে অধিকাংশ (পন্ডিতদের) অভিমত এবং তা বলিষ্ঠতমও বটে।

ইসলামের দৃষ্টিতে - গণতন্ত্রের সংশয়সমূহ

গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত কুফ্র এবং সুস্পষ্ট শির্কের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা:

গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy। Democracy শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দ Demos ও Cratus থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল মানুষ/জনগণ' এবং Cratus অর্থ পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে।

আব্দুল ওয়াহ্হাব আল-কিলালি বলেছেন, "সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একই আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তা হচ্ছে 'প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী জনসাধারণ'। সারকথা, গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের প্রভুত্বের নীতি।" (মাওসু'আত আস্-সিয়াসাহ: ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৫৬)

অতএব গণতন্ত্র এমন একটা পদ্ধতি যার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সংরক্ষিত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং যা আল্লাহ্র ঐ অধিকারের বিপক্ষে আচরণ করতে শেখায়। এবং এটা মানুষকে আল্লাহ্র পরিশুদ্ধ একটি ইবাদত হতে ফিরিয়ে শির্কের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করায়। অনেক ক্ষেত্রে এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"এবং আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।"*** (সূরা আর রা'দ ১৩:৪১)
তিনি আরও বলেন, ***"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?"*** (সূরা আশ-শূরা ৪২:২১)

এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দিধায় তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে। এভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রতিনিধিত্ব পায় আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশগুলোর উপর।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে ওরা অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।"*** (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৪৩-৪৪)

অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল 'তাওয়াগীত' এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হল আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্র নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই 'তাগুত' বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা দাবী করে যে তারা বিশ্বাস করে আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা তাগুতের কাছে তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে এর (তাগুতের সাথে) কুফ্রী করা আদেশ দেয়া হয়েছিল... ।"*** (সূরা আন-নিসা ৪:৬০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, *"আল্লাহ্র ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেয় তাহলে সেই হল 'তাগুত'। এই কারণে যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল 'তাগুত'।"* (আল-ফাতওয়া, খন্ড-২৮, পৃঃ ২০০)

হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, *"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) শাসন পদ্ধতি ব্যতীত যারা অন্য কোন পদ্ধতিতে শাসন করে তারাই তাগুত। মানুষ আল্লাহ্র পাশাপাশি যাদের ইবাদত করে অথবা মানুষ যে ব্যক্তির ইবাদত করে আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যম মনে করে এদেরকেও তাগুত বলে বিবেচনা করা যায়। যদিও এক্ষেত্রে তারা নিশ্চিত নয় যে তারা আল্লাহ্র একক ইবাদত করছে না দ্বৈত ইবাদত করছে। সুতরাং এরাই হল তাওয়াগীত (তাগুতের বহুবচন) এবং যদি আপনি এই সকল তাগুতের প্রতি এবং এদের সাথে জনগণের শর্তাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে এটা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে,*

জনগণ আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে তাগুতের ইবাদতের দিকে, আল্লাহ্‌র শাসন হতে তাগুতের শাসনের দিকে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে তাগুতের আনুগত্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে।" (ইলাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, খন্ড ২৮, পৃঃ ৫০)

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহ.) বলেন, "এবং কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল (সাঃ) এর মুখ নিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফ্‌র এবং শির্‌ক। এতে কোন সন্দেহ নেই।" (আদ্বওয়া আল-বাইয়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮২-৮৫)

এখন সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বৈপরিত্য ঘোষণা করে। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে লুকায়িত শির্‌কের ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন অনুভব এই মুহূর্তে আমরা করছি না।[১১]

যদি পাঠকগণ শুরু হতে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে পরিতৃপ্ত না হন তাহলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের রায় সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়াদি সমৃদ্ধ কোন প্রবন্ধ অথবা বই পড়ুন। কেননা এই প্রবন্ধে আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। আমরা এই প্রবন্ধটিকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যাখ্যার সাথে সংমিশ্রন করে জটিলতর করতে চাচ্ছি না।

---

১১ এমনকি "ভোটের পক্ষে ও বিপক্ষে" শীর্ষক বইয়ের লেখক নূন্যতম এই সত্য স্বীকার করেছেন যে, একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগদান করা অবশ্যই অনুমোদন যোগ্য নয়। তার বইয়ের প্রথম ধাপে তিনি বলেছেন যে, "বর্তমান আধুনিক সময়ের অবস্থা ইসলাম থেকে অনেক দুরে। প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের নিকট যিনি পবিত্র, মহান এবং সর্বোচ্চ। তাই কেউ যদি এমন কোন শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় প্রকৃতপক্ষে যার ভিত্তি মানব রচিত অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রণীত শরীয়াহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক অথবা যা ইসলামিক শরীয়াহ্‌কে বাতিল বলে ঘোষণা করে, তাহলে এ ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিম আলেমরা একমত যে সেই শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন যোগ্য নয়।"

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পক্ষে যোগদান সংক্রান্ত সংশয়গুলোর ব্যাপারে ফয়সালা

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদান করাকে অনুমোদন দেয় সত্যিকার অর্থে তারা পথভ্রষ্টতার বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে যে, অনিবার্যভাবে শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ, তারা পথভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে রয়েছে। আর কতক রয়েছে যারা ভুল ধারণা ও সন্দেহ বশতঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যোগদানকে বৈধ মনে করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলো নিম্নে ধারাবাহিকভাবে খন্ডন করা হলঃ

১। মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইউসুফ (আ.) -এর যোগদান সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা

মহান আল্লাহ্ বলেন, "রাজা বলিল, ইউসুফকে আমার কাছে লইয়া আইস; আমি তাহাকে আমার একজন সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর রাজা যখন তাঁহার সহিত কথা বলিল, তখন রাজা বলিল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস ভাজন হইলে। ইউসুফ বলিল, 'আমাকে দেশের ধন ভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক।' একইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্ম পরানদের প্রতিফল নষ্ট করি না।" (সূরা ইউসুফ ১২: ৫৪-৫৬)

তাই যারা ইউসুফ (আ.) -এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আ.) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে না?

যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে কারাগারে ইউসুফ (আ.) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ***"আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান/হুকুম/আইন দেয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না। এটাই সরল সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"*** (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আ.) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/হুকুম/আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যেঃ ***"আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান/হুকুম/আইন দেয়ার অধিকার নেই।"***

প্রথমতঃ যারা এই (সূরা ইউসুফ ১২: ৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে তাদের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আ.) -এর শরীয়াহ্ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই। বরং এই আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের দিকে পা বাড়িয়ে ছিলেন।

ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহ.) বলেনঃ "ইউসুফ (আ.) -এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।" (জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই আল-কুরআন, ৯/২১৭)

আল-বাঘাবী বলেনঃ মুজাহিদ (রহ.) ও অন্যান্যরা বলেছেন, "ইউসুফ (আ.) তাদেরকে অতি বিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।"

আরও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ.) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল।

ইবনে জারীর আত-তারাবী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন, রাজা, ইউসুফ (আ.) কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন। এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়ঃ *"এই ভাবে আমি ইউসুফ (আ.) -কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন।"*

"... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন ...", এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আ.) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।

আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা.) ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আ.) কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেন, যখন রাজা, ইউসুফ (আ.) -এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আ.) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসত। এই ধরনের কথা পাওয়া যায় আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্যদের বর্ণনায়, ইউসুফ (আ.) এর প্রতি রাজার উক্তিতে - যখন রাজা, তাঁর পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায় বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে। রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো। এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই। (আল-জামী'লি আহকাম আল-কুরআন, খন্ড ৯/২১৫)

তাই এক্ষেত্রে যদি এই রকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (সূরা ইউসুফ ১২: ৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুখীণ হবে এবং ভুল হবে। কেননা ইসলামের একটা নীতি হল, যদি কোন সম্ভবনা/সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

আরও বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ উসুলের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের শরীয়াহ্‌ আমাদের শরীআহ হিসেবে বিবেচিত যদি না তা আমাদের শরীয়াহ্‌র সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাই কেউ যদি কল্পনার বশীভূত হয়ে শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে বলে যে, ইউসুফ (আ.) তাঁর প্রদত্ত শরীআহ মানেননি তাহলে তাকে বলতে হবে যে, ইউসুফ (আ.) যদি এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকে মুহাম্মদ (সা.) এর শরীয়াহ্‌ মানতে হত।

২। নীতিমালা: দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতি

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দু'ভাবে ব্যবহার করে থাকে:
ক) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া।
খ) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া।

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হল, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি। শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দু'টি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দু'টি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ কাউকে যদি দু'টি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তাহলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়: কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে থাকবে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্‌ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শির্‌ক (আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর। এটা হবে ২৫% এলকোহল বাদ দিয়ে ৫০% এলকোহল গ্রহণ করার মতো।

৩। নীতিমালা: ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা

এই নীতি বা উসুলটিও পূর্বের নীতির মতোই। এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হল শিরক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায়। শায়খ আবু বাশির মুস্তফা হালিমাহ, অপর এক শায়খের (ড. সাফার আল-হাওয়ালী রচিত "An open letter to George W Bush") বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উক্ত শায়খ (হাওয়ালী) আমেরিকার মুসলিমদেরকে, বুশকে ভোট দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন। শায়খ হালিমাহ লিখেছেন, আমার বক্তব্য হল, এ শায়খের কথাগুলো নানা কারণে বানোয়াট ও বর্জনীয়। তাদের ক্ষেত্রে আমেরিকার মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। গণতন্ত্র - যা আমেরিকাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাতে একমাত্র আক্বীদা ও শরীয়াতের বিভ্রান্তির দ্বারাই অংশগ্রহণ করা সম্ভব, এবং ফলাফল কখনোই প্রশংসা লাভ করতে পারে না; আর এর থেকেই যতই সুবিধা লাভ করা যাক না কেন- তা কখনোই অজুহাত হতে পারে না। আর এক্ষেত্রে এটা কিভাবে সম্ভব হয় যেখানে এটি শরীয়াহ্‌ ও এর নীতির বিরুদ্ধে। আর এ ব্যাপারটি আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় পরিষ্কার করা চেষ্টা করেছি। (ওয়াকাফাত মা'আশ শাইল সাফার, পৃঃ ১৮)

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ***"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন: এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।"*** (সূরা আল-বাকারা ২: ২১৯)

সেই সাথে আল্লাহ্‌ (সুব.) আরো বলেন, ***"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর এসব নোংরা অপবিত্র, শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"*** (সূরা মায়িদা ৫: ৯০)

ইবনে কাসির (রহ.) প্রথমোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হজম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়া খেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, "... কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।" (সূরা আল-বাকারা ২: ২১৯)

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো শির্‌ক, আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।

৪। নীতিমালা: আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল

"আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়"- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়।

আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। এই হাদীসটির অপব্যবহার আরো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এজন্য আমরা এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা তুলে ধরছি, ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। আব হামিদ আল গাজ্জালী (রহ.) বলেন, "গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর হাদীস (প্রত্যেক

আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যদি অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্য খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়ত বিরোধী- যা আরেকটি অন্যায়। সুতরাং সে যদি সচেতন থাকে (ভুল পথের ব্যাপারে) তাহলে, যেন শরীয়তের উপর অটল থাকে। কিন্তু সে যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে তাহলে তার উপর অজ্ঞতার গুনাহ বর্তাবে, কারণ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ। তাছাড়া, শরীয়াহ্ যেখানে ভালো কাজের (নিয়্যতের বিশুদ্ধতা) ব্যাপারেই এমন (সতর্ক), সেখানে খারাপ কাজ কিভাবে ভালোতে পরিণত হয়? এটাতো অসম্ভব। সত্যিকার অর্থে, যে জিনিসগুলো অন্তরে এমন ধারণার জন্ম দেয় তা হচ্ছে অন্তরের গোপন খেয়াল খুশী বা কামনা-বাসনা ...।"

এরপর তিনি আরো বলেছেন, "এর দ্বারা যা বোঝানো হচ্ছে তা হলো কেউ যদি অজ্ঞতাবশত ভাল নিয়্যতে খারাপ কাজ করে তাহলে তার কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে দ্বীনে নতুন হয় এবং ঐ ইলম অর্জনের সময় না পায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ***"অতএব তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জান।"*** (সূরা আন-নাহল ১৬: ৪৩)

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) আরও বলেছেন, "সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এই বাণীঃ "প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল"- তিনটি জিনিসের (ইবাদত, গুনাহ ও মুবাহ) মধ্যে শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহাত (অনুমতি প্রাপ্ত আমল) -এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না। হ্যাঁ, নিয়্যতের একটি প্রভাব এক্ষেত্রে (গুনাহের ক্ষেত্রে) আছে; তা হলো খারাপ কাজের সাথে যদি (আরও) খারাপ নিয়্যত যুক্ত করা হয় এবং এটা তার বোঝা বৃদ্ধি করে আর পরিণতি হয় চূড়ান্ত খারাপ- যা আমরা 'কিতাবুত তাওবা' -তে উল্লেখ করেছি।" (ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন, ৪/৩৮৮-৩৯১)

শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়া সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ বলেন, "আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) যে উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফ্র হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফ্র, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।" (আল-জামি ফী তালাব আল ইলম আশ শরীফ- ১/১৪৭-১৪৮)

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফ্র বা শির্ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে আমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করতাম!

৫। নীতিমালা: ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা

গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলেন তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকেন। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করেন। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সজজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুল স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়।[১২]

---

১২ এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না- গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ্)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলেন তাঁদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। অর্থাৎ, কোন চোরের চুরি বন্ধ করতে তাকে হত্যা করা যাবে না বা কাউকে সুদ দেয়া থেকে বিরত রাখতে তার টাকা ছিনতাই করা যাবে না অথবা পরিবারকে তার অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পরিবারের মানুষদেরকে অপহরণ করা যাবে না। এই সামান্য বিষয়টি বোঝা মোটেই কঠিন কিছু নয় যদি সে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার বিষয়টি বোঝে।

এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, "এবং (ভালো কাজের) আদেশ ও (মন্দ কাজের) নিষেধকারীরা যদি জানে যে এর প্রতিফলে ভালোর সাথে সাথে মিশ্রিত হয়ে কিছু মন্দও ঘটবে, তাহলে তাদের জন্য এটি করার অনুমতি নেই যতক্ষণ না তারা এর ফলাফলের (বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। যদি ভালো ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তবে তারা এটি চালিয়ে যাবে। আর যদি মন্দ ফলাফলের প্রাধান্য থাকে, তাহলে তাদের জন্য এটি করা নিষেধ, যদিও এর দ্বারা কিছুটা ভালো (ফলাফল) বিসর্জন দিতে হয়। এক্ষেত্রে এই ভালো কাজের আদেশ করা, যার পরিণতি খারাপ একটি খারাপ বা মুনকার-এ পরিণত হয় যা আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা.) অবাধ্যতা বৃদ্ধি করে।" (আল আমর বিল মারুফি ওয়ান-নাহিয়্যু 'আন আল-মুনকার, পৃঃ ২১)

ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, "সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ (সুব.) ও রাসূল (সা.) বেশী অপছন্দ করেছেন (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয়। যদিও আল্লাহ্ (সুব.) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন।" (ইলাম আল-মুওয়াক্কীন, খন্ড ৩, পৃঃ ৪)

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্‌ক বা কুফ্‌রীর মতো মূল্য দিতে বলে। দু'টি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা। এক্ষেত্রে যদি আমরা ইরাকের মুসলিমদের উপর অত্যাচার কমানোর কথা চিন্তা করি, তাহলেও কি আমরা শির্‌ককে বিনিময় হিসাবে ধরতে পারি। আল্লাহ্ বলেছেন, ***"ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"*** (সূরা আল-বাকারা ২: ২১৭)
এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুব.) শির্‌ক ও কুফ্‌রীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেছেন, "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফ্‌রী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।" (আল-ফাতওয়া- ২৮/৩৫৫)

শায়খ আলী আল-খুদাইর তাঁর "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" -এই সাক্ষ্য দানে আহবান" বইটিতে শায়খ সুলাইমান বিন সাহমান (রহ.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "আল-ফিৎনাহ হলো কুফ্‌র। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াহ্ বিরোধী।"

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্‌ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এটা এ জন্যই যে, মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্‌ক করার মাধ্যমে।

৬। নীতিমালা: নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি

যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল!

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত: অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারের:

(১) দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়
(২) জীবনের জন্য আবশ্যকীয়
(৩) মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয়
(৪) রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্থে আবশ্যকীয়
(৫) সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো জ্বিনা করা বা কোন মাহ্‌রাম মহিলাকে নিক্বাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারে না যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়ত, শির্‌ক বা কুফ্‌রের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্‌ক এবং কুফ্‌র থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইকরাহ (চূড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা শির্‌ক ও কুফ্‌রকে হালাল করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে পারি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেছেন, নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াহ্‌তে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্‌ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ (সুব.) বলেছেন, ***"বলুন: আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।"*** (সূরা আল-আরাফ ৭: ৩৩)

এই বিষয়গুলো সকল শরীয়াহ্‌তেই হারাম করা হয়েছে, আর এগুলোর ব্যাপারে সাবধান করতে আল্লাহ্‌ নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই এগুলো হালাল ছিল না, কঠিন সময়েও নয়। আর এ কারণেই এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়।

শায়খ আলী আল খুদাইর, শায়খ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: *নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।"* (সূরা আল-বাকারা ২: ১৭৩)

সুতরাং এখানে 'অনন্যোপায়' অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয়।" তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেন, এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা সেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে?! এ ধরনের তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- ***"বেচাকেনা তো সুদেরই মতো।"*** (সূরা আল-বাকারা ২: ২৭৫)। [হিদায়াত আত-তারিক, পৃঃ ১৫১]

শায়খ আলী আল খুদাইর বলেছেন: "আমরা বলি, অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত জীব ভক্ষণের অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা শির্‌কের সমাবেশে প্রবেশের অনুমতির দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ও তাগুত সরকারের সাথে জোট করা হয় 'দাওয়ার উপকারীতা'র নামে।" (আল জামু ওয়াত তাজরিদ ফী শারহি কিতাব আত তাওহীদ, পৃঃ ১২১)

৭। নীতিমালা: জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফ্‌রী ক্ষমার যোগ্য

এর আগের (৬ নং) পয়েন্টে আমরা এব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফ্‌র বা শির্‌ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায়

যে, এটি একটি ইকরাহ (জোর-জবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোর-জবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হল, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোরপূর্বক করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।

আলা আদ্-দ্বীন আল-বুখারী সংজ্ঞা অনুযায়ী জবরদস্তি হলোঃ কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় যা সে করতেও সক্ষম। তাই অন্য ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয় এবং জবরদস্তি বাস্তবায়নে তার সন্তুষ্টি দূরীভূত হয়।

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, "এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।" (নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ, ২/৭)

সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 'স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'।

'ইক্‌রাহ' -এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্‌র (রহ.) বলেন, ইক্‌রাহ'র ৪টি শর্ত রয়েছেঃ

প্রথমতঃ যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে।

তৃতীয়তঃ তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না।

চতুর্থতঃ যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছে। (ফাত্‌থ আল-বারি, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১)

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ বা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-ও শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

জোর জবরদস্তি সংক্রান্ত একটি উল্লেখ্য বিষয়

বর্তমানে ইরাক ও অন্যান্য স্থানে আমাদের ভাই-বোনদের ওপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চলছে, তাতে তারা অনেকেই 'ইকরাহ' -এর পরিস্থিতিতে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অবস্থা ইকরাহ-র সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর আওতায় পড়ে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে আল্লাহ্‌র শত্রুরা (আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুন) আমাদের ভাই বোনদের নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে, হত্যা করেছে এবং এখনও করছে। এসব অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা কেউ পড়লে সে অবশ্যই বলবে যে, তাদেরকে ঐসব অবস্থায় শির্‌ক ও কুফ্‌র করতে বাধ্য করলে তাদের কিছুই করার ছিল না।

কিন্তু, বাস্তবতা হলো যে, ইরাকের ঐসব নির্যাতিত ভাই-বোনরা নয় বরং সেই সব মানুষ নির্বাচনের দিকে ডাকছে যারা মোটামুটি আরামেই আছেন। আর একারণেই এসব মানুষের ক্ষেত্রে ইকরাহ'র এই নীতি প্রয়োগ করা যায় না। পৃথিবীর এক অংশের মুসলিমদের উপর অত্যাচার হচ্ছে সেটিকে তারা নিজেদের কুফ্‌র বা শির্‌কের জন্য অজুহাত করতে পারেন না। এদেরকে কোন অবস্থাতেই নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে না, আর এ অবস্থাকে নিপীড়ন বলা যাবে না।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায়

যারা এই শির্‌কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফ্‌রীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংশয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদনযোগ্য নয়, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলমান ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়। এটা হলো একটি দিক। তাছাড়াও এটা স্পষ্ট যে তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে সমাজে কিছু ভাল আনয়নের উদ্দেশ্য। যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শির্‌ক ও কুফ্‌রী থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শির্‌ক ও কুফ্‌রী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফ্‌রীর বাইরে নিয়ে আসে না।

অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্‌ক বা কুফ্‌র করলেই সেটা ক্ষমা করা হবে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। তবে যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি জায়েয করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা এই প্রবন্ধে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফির বলাটা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা। যতক্ষণ না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এসকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে তাকফির করতে পারি না।

যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাকদিসী বলেন, "এর মাঝে কিছু মানুষ আছে, যাদেরকে ডেকে আনা হয় ঐসব ব্যানার বা পোস্টারের সামনে যেখানে লেখা থাকে, "ইসলামই একমাত্র সমাধান" (অর্থাৎ ইসলামী দলে ভোট দেন) অথবা এ ধরনেরই কোন শ্লোগান যা দ্বারা মুশরিক শাসকরা জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকে। অতঃপর তারা তাদেরকে ভোট দেয় এবং নির্বাচিত করে, কারণ তারা ইসলামকে ভালবাসে এবং শরীয়তের অনুগত থাকতে চায়; তাছাড়া এই শির্‌কের ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই বা শির্‌কের গভীরে প্রবেশ করার ঐরূপ ইচ্ছাও তাদের নেই যেরূপ রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যারা ইসলামের বেশ কিছু আইন নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। সুতরাং যারা সরাসরি আইন প্রণয়নের অধিকার নেয়নি বা কুফ্‌র আইনের সম্মানে শপথ বাক্য পাঠ করেনি বা এর কাছে বিচার প্রার্থনা করেনি অথবা কথা ও কাজে এমন কোন কুফ্‌র করেনি যা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ করে থাকে; তাদের (তাকফির করার) ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, এ কথা সবারই জানা যে একজন ভোটার কখনও সরাসরি এসব কাজ করে না। বরং সে শুধু তার পছন্দের প্রার্থীকে/ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে।"

তিনি আরও বলেন, আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফ্‌র এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটার) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। এরপরও যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফ্‌রী করল। সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্যসমূহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইন প্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবে না। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত জানে না তার কাছে মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফ্‌রী কাজে লিপ্ত আছে। কারণ, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; আর তাছাড়া 'গণতন্ত্র', 'পার্লামেন্ট' গুলো সবই বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই

বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে; তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তিসমূহ দূর করা।

উপসংহার

হে পাঠক! কোন সন্দেহ নাই মুসলিমরা আজ ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। আজ আমাদের ভাই-বোনদের উপর সংঘটিত হয়ে চলছে পৃথিবীর নৃশংসতম নির্যাতন, গণহত্যা; যা দেখে চোখের পানি ঝড়ছে আর হৃদয়ে আগুন জ্বলছে। এই বর্তমান অবস্থা দেখেও যদি কারো অন্তর নাড়া না দেয় তাহলে সে যেন তার ঈমানের ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করে আর তার মৃত অন্তরকে পরীক্ষা করে দেখে।

একই সাথে, আমরা আমাদের ভাই-বোনদের সাবধান করে দিতে চাই শয়তানের চক্রান্ত থেকে যে সর্বাত্মকভাবে আমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। উত্তম আমলের নামে, ইসলামের প্রতি আমাদের ভালবাসাকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে তারা আমাদের শির্কের মাঝে প্রবেশ করাতে সদাতৎপর। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে, সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডই নিষিদ্ধ নয়। যদি এগুলো শির্ক বা কুফ্রের আওতায় না পড়ে এবং রাসূলের (সা.) সুন্নত অনুযায়ী পালন করা হয় তাহলে কোন বাধা নেই। যেমন, আলোচনা সভা, সমাবেশ, প্রচারণা, ইত্যাদি কিছু রাজনৈতিক কর্মকান্ড যেগুলো শরীয়তের কোন নিষেধ নেই।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের প্রয়াসটি ছিল সাম্প্রতিক কালে উত্থিত এই বিতর্ককে ঘিরে যা বেশ কিছু লেখকের প্রবন্ধকে ঘিরে জমে উঠেছে। আমরা শুধু চেয়েছি, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং তাদের কিছু সংশয়ের জবাব দিতে এবং তাদের যুক্তি তর্কাদিগুলো খন্ডন করতে।

আমাদের এই প্রয়াসের মাঝে যদি সঠিক কিছু থাকে, তাহলে তা নিশ্চয় আল্লাহ্ (সুব.) -এর তরফ থেকে আর এর ভেতরে যদি কোন ভুল বা সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে তা আমাদের এবং শয়তানের থেকে, আমরা তার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের উপর।